ইমাম সিরিজ : ০৬

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله

— জীবন ও কর্ম —

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله

জীবন ও কর্ম

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله

— জীবন ও কর্ম —

সমকালীন প্রকাশন

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀

আবুল হাসানাত কাসিম

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০২০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
www.islamiboi.com
www.wafilife.com

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 265.00, US $ 10.00 only.

ISBN: 978-984-94844-9-3

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

প্রকাশকের কথা

অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী পাঠের মাধ্যমেই অতীতের সময়কে সুষমভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাদের জীবন থেকে উঠে আসা সময়ের চিত্রপটে আমরা আঁকতে পারি ভবিষ্যতের গল্প। অতীতের যে সকল চরিত্র ইতিহাস এবং সভ্যতার বিনির্মাণে প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের জীবন থেকে আমরা তুলে আনতে পারি নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজ, নতুন সময় রচনার রসদ। প্রবীণদের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকেই নবীনরা সময়কে চিনতে শিখবে, আঁকতে শিখবে নতুন দিনের প্রেক্ষাপট; এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের সোনালি ইতিহাসের এক বিশাল অংশজুড়ে আছেন আমাদের ইমামগণ। জ্ঞানের সাগরে অহর্নিশ ডুবে থাকার যে প্রেষণা, তার এক বিস্ময় জাগানিয়া চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় তাদের জীবনীতে। জীবনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে, সেই আলোর মশাল সবখানে, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে তাদের মধ্যে যে তাড়না, যে প্রচেষ্টা আমরা খুঁজে পাই, তা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। একটি হাদিসের জন্য কিংবা একটি সনদ যাচাইয়ের জন্য তারা পায়ে হেঁটে গেছেন দূর থেকে দূরান্তে। কোথাও বা পিচ্ছিল, কোথাও পঙ্কিল, কোথাও বা বন্ধুর পথ। তবু তারা দমে যাননি কখনোই। হৃদয়ের গভীরে জ্ঞানের যে নহর বয়ে বেড়িয়েছেন, সেই নহরের অমৃত সুধা মানুষকে পান করাতে তারা ছুটে গিয়েছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে।

নববি আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমাদের ইমামগণ জীবন অতিবাহিত করেছেন। সেই আদর্শ থেকে বিচ্ছুরিত আলো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে দিতে তারা জীবনভর চেষ্টা করেছেন। তাদের সেই চেষ্টার ফলে আজ আমরা কুরআন, হাদিস এবং ফিকহ-বিষয়ক জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার দেখতে পাই আমাদের সামনে। শুধু কি তা-ই? সযত্নে তারা তৈরি করেছেন আরও অনেক মহামানব, আরও অনেক ইমাম, যারা তাদের জ্ঞান তুলে ধরেছেন অতি উচ্চে, এক উচ্চতর আসনে।

আমাদের এ সকল ইমামের জীবনী নিয়ে বাংলা ভাষায় অল্প কিছু কাজ হয়েছে মাত্র। অথচ, যুগের এই মশালধারী মানুষগুলোকে যতই পাঠ করব, ততই আমরা তাদের জ্ঞান, তাদের বিপুল রত্ন-ভান্ডারের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হব। জ্ঞানের জন্য তাদের চেষ্টা, তাদের শ্রম, মেহনত, তাদের অধ্যবসায়, তাদের তাকওয়া, ঈমান আর তাওয়াক্কুলের পরিচয় জানতে পারলে আমরা সমৃদ্ধ করতে পারব আমাদের জ্ঞানের পরিধি, উন্নত করতে পারব আমাদের ইসলামি জীবন। আগামী সভ্যতাকে বিনির্মাণ করতে, সময়কে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলতে এবং পৃথিবীকে নবধারায় বিকশিত করতে আমাদের মহান ইমামগণের জীবনী পাঠ করা অত্যাবশ্যক। নিজেদের জন্য তো বটেই, পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এই মহামানবদের জীবনী অতীব জরুরি।

এই চিন্তা এবং সময়ের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই সমকালীন প্রকাশন 'ইমাম সিরিজ' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের ইচ্ছে, মহান ইমামদের জীবনীগুলো আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে পাঠকদের হাতে তুলে দেবো, ইনশা আল্লাহ।

সিরিজের ষষ্ঠ বই হিসেবে আমরা ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর জীবনী পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম প্রতিভাধর এই মনীষীর আলোকিত জীবনকে এক অভিনব ভঙ্গিতে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। ফিকহশাস্ত্রে দক্ষতা, তাফসির ও আরবি সাহিত্যে পারঙ্গমতা, যুহদ ও ত্যাগ-তপস্যায় একনিষ্ঠতা, জিহাদের ময়দানে পাহাড়সম দৃঢ়তা-সহ তার বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রায় সবদিক নিয়েই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ে। আশা করি, আর্থসামাজিক পদস্খলনের এই যুগে পাঠকগণ এতে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

ইমামদের জীবনী নিয়ে আরবি ভাষায় প্রচুর বইপত্র রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সেই বইগুলো ঘেঁটে অতীব প্রয়োজনীয় অংশগুলোর সমন্বয়ে প্রস্তুত করেছি এই সিরিজ। যারা এখানে শ্রম দিয়েছেন এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ তাদের

সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ইমামদের জীবনের মতো আমাদের জীবনও ওহির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশায়।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

সম্পাদকের কথা

বরেণ্য ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূল্যবান উপদেশ এবং তাদের জীবনের নানা ঘটনা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কুরআন, হাদিস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে এর হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে মানুষের জীবনবৃত্তান্ত স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের একটি মৌলিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে হিজরি দ্বিতীয় শতক মোতাবেক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের মুসলিম মনীষীগণ যখন লক্ষ করেন, ইসলাম ক্রমশ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে; অথচ ইসলামের মৌলিক পরিচয় সম্পর্কে নবদীক্ষিত মুসলিমদের অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুযোগ-সন্ধানীরা মিথ্যা হাদিস বানিয়ে সমাজে প্রচার করছে—তখন তারা ইসলামের সুরক্ষার লক্ষ্যে এই শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন এবং এর নাম দেন—চরিতশাস্ত্র। এই শাস্ত্রে তারা হাদিস বর্ণনাকারীদের ইলম, হিফয, সততা, নিষ্ঠা, লেনদেন এবং চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা করেন; সর্বোচ্চ সতর্কতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির সাথে তাদের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

পরবর্তী সময়ে শাস্ত্রটি আরও ব্যাপকতা লাভ করে। তখন ইলম ও নীতি-নৈতিকতার পাশাপাশি বরেণ্যদের চিন্তা, মনন, কর্ম, সম্পর্ক, বুদ্ধিবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিকতার নানা দিক এতে স্থান পায়। এরপর সেই সূত্র ধরেই একসময় জীবনী-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে; পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মধ্যে সেতুবন্ধন-স্বরূপ ব্যক্তি, স্তর ও শতক-ভিত্তিক জীবনী-সাহিত্যের সম্ভার গড়ে ওঠে। ফলে সকল যুগের আলিম,

ফকিহ, মুহাদ্দিস, আবিদ, যাহিদসহ সর্বস্তরের জ্ঞানী-গুণীদের জীবনচরিত এবং তাদের দ্বীনি, ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান থেকে মুসলিম উম্মাহ ও অন্যদের উপকার লাভের সুযোগ তৈরি হয়।

এভাবে চরিতশাস্ত্র বইয়ের নির্জীব পাতা ও গবেষকের নিথর টেবিল থেকে জীবনের মুখরিত আঙিনায় প্রবেশ করে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চেতনা ও আদর্শ সঞ্চারিত করে। অতীত ও বর্তমানের সাথে গভীর ও নিবিড় একটি যোগসূত্র তৈরি করে এবং উম্মাহর সর্বশেষ সদস্যকে প্রথম সদস্যের সঙ্গে স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। আমাদের ইমাম সিরিজের ষষ্ঠ বই 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ' সেই স্বর্ণশৃঙ্খলেরই একটি গ্রন্থ।

এই সিরিজের প্রতিটি বই সাধারণ শ্রেণির মুসলিমদের চিন্তা, বোধ ও রুচির প্রতি লক্ষ রেখে রচনা করা হয়েছে। তাই জীবনীর পূর্ণাঙ্গতা বিধানের জন্য অতি সংক্ষেপে ও নিরপেক্ষভাবে ইমামদের ফিকহি যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর সব ধরনের বিতর্ক পাশ কাটিয়ে তাদের জীবন, কর্ম, চিন্তা ও চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা হয়েছে। সেখান থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। আশা করছি, ইমাম সিরিজের সবগুলো বই পাঠকের বেশ উপকারে আসবে এবং ব্যাপক পাঠক-প্রিয়তা লাভ করবে, ইনশা আল্লাহ।

আকরাম হোসাইন

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

সংকলকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যাঁর অপার করুণায় সকল পুণ্যময় কাজ পূর্ণতা লাভ করে। অগণিত সালাত ও অসংখ্য সালাম মানবতার মুক্তির দূত মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যার আলোচনা রহমত ও শান্তির বার্তা বয়ে আনে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একটি নাম, একটি ইতিহাস। পৃথিবীর শব্দভান্ডারে 'ক্ষণজন্মা' বলতে যদি কোনো শব্দ থেকে থাকে, তবে চিন্তাতীতভাবে তার প্রয়োগস্থল হতে পারেন এই মহামনীষী। তার কথা, কাজ, চিন্তা, উদ্যম—সবই যেন এর জানান দিয়ে যায়। ইসলামের সোনালি যুগের প্রবাদপ্রতীম এই মহামানব ছিলেন একাধারে একজন বিজ্ঞ হাদিস বিশারদ, উঁচুমাপের ফকিহ ও গবেষক, বিনিদ্র সাধক এবং জিহাদের ময়দানে নির্ভীক যোদ্ধা। মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজাহিদ, আবিদ ও যাহিদ—প্রতিটি শ্রেণির অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ তাকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে চলেন। সবাই তাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন।

মহান ব্যক্তিদের মতো তাদের জীবনালেখ্যও হতে হয় মহৎ কিছুর ধারক। ব্যক্তি ও তার জীবনীর মাঝে সমতা বজায় না রাখা গেলে এমন লেখার সার্থকতা কোথায়? এজন্য প্রয়োজন দক্ষ একটি হাতের, যার সুনিপুণ ছোঁয়ায় উঠে আসবে অসাধারণ কিছু। অথচ এর ছিটেফোঁটাও আমার নেই। কেবল লেখার তাগিদে লেখা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষায় আমাদের মহান ইমামগণের নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ আজ অবধি উঠে আসেনি।

ব্যক্তি যত বড় হন, তার নামে প্রচলিত কল্পকাহিনীর ফিরিস্তিও তত বেশি দীর্ঘ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। লোকমুখে তার ব্যাপারে অসংখ্য অবাস্তব কেচ্ছা-কাহিনী শোনা যায়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সৎকর্মের প্রতিদান কিংবা মহান ব্যক্তিদের কীর্তিগাথা আলোচনায় এসবের খুব চর্চা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকটা না জেনেই একজনের ঘটনার সাথে অপরজনের ঘটনা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।

অজ্ঞতার কুপ্রভাব হিসেবে ইদানীং আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে। ক্ষুদ্র মনে হলেও সামগ্রিক বিচারে ব্যাপারটা বোধ করি বেশ অকল্যাণকর ঠেকছে। মহান মনীষীদের নামে এসব বাস্তবতা বিবর্জিত ঘটনার ছড়াছড়িতে অনেক দ্বীনি ভাই খোদ 'মনীষী' বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছেন। ইসলামি সভা-সম্মেলনে তাদের প্রসঙ্গ উঠলেই কেউ কেউ একে 'কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে মনগড়া আলোচনা' আখ্যা দিয়ে বসছেন! অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এটাই অমোঘ সত্য। তাদের নামে যতসব মনগড়া গালগল্পের হিড়িক পড়েছে, এটা তারই বিরূপ প্রভাব। এর ফলে তাদের কর্মমুখর জীবনের শিক্ষণীয় দিকগুলো আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে এবং তাদের মহামূল্যবান জীবনের বহু অমূল্য রত্ন থেকে আমাদের বরাবরের মতো বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে।

যাহোক, সার্বিক বিবেচনায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর আলোকিত জীবন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা ছিল বহুল প্রতীক্ষিত বিষয়। তথ্যের পূর্ণতার পাশাপাশি প্রামাণিক দিক থেকেও যা হবে তার অন্যতম জীবনালেখ্য এবং বাংলাভাষী পাঠকদের পড়ার তালিকায় এক অভূতপূর্ব সংযোজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়ায় আমাদের সমকালীন পরিবার এবার 'ইমাম সিরিজ' নামে নির্বাচিত বেশ কজন মহান মনীষীর জীবনী প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই ধারাবাহিকতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

শেষ করার পূর্বে পাঠকের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলে নেওয়া যাক। যদিও কথাটি আগে একবার বলা হয়ে গেছে, তবুও পুনরাবৃত্তি জরুরি মনে করছি। যেসব ঘটনা লোকমুখে প্রসিদ্ধ; কিন্তু নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রে প্রমাণিত নয়, সেসব ঘটনা এখানে আনা হয়নি।

একজন লেখকের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকে পাঠকবৃন্দকে যথাসম্ভব নির্ভুল লেখা উপহার দেবার। তবু মানুষমাত্রই ভুল। লেখকও আমাদের মতো রক্তে-মাংসে গড়া

একজন মানুষ। অতএব, বিজ্ঞ পাঠকদের নিকট বিনীত অনুরোধ, এ গ্রন্থে কোনো প্রকার অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে কিংবা সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে মনে হলে, আশা করি, সরাসরি প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের বাধিত করবেন।

মহান রবের নিকট আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন আপন দয়াগুণে গ্রন্থখানা কবুল করে এর প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন।

আবুল হাসানাত কাসিম

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

সমকালীন পরিবেশ

রাজনৈতিক অবস্থা

কালের বিচারে উমাইয়া খিলাফত ইসলামের প্রধান চারটি খিলাফতের মধ্যে দ্বিতীয়। এটি মূলত উমাইয়া পরিবার তথা রাজবংশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিশিষ্ট সাহাবি মুয়াবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে এই শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলেও, মূলত, ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতলাভের মধ্য দিয়ে উমাইয়া পরিবার প্রথম ক্ষমতায় আসে। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারা দামেশক শহরটিকে নিজেদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে।

পরিধির দিক থেকে উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল তৎকালের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। কারণ, এ সাম্রাজ্যটি ককেসাস, ট্রান্সঅক্সানিয়া, সিন্ধু, মাগরেব, কর্ডোবা ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (আন্দালুসিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত। আর শাসনকালের বিচারে পঞ্চম। অর্থাৎ, যে সকল সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছে, তাদের মধ্যে উমাইয়া বংশ ছিল পঞ্চম স্থানে।

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে উমাইয়া খিলাফতের গোড়াপত্তন হলেও তিনি ও তার পুত্র ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও হুসাইন ইবনু আলির সংঘাতের সূত্রপাত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক যুদ্ধ-বিগ্রহের

পর অবশেষে দ্বিতীয় মুআবিয়ার হাত থেকে উমাইয়া রাজবংশের ক্ষমতা চলে যায় মারওয়ান ইবনুল হাকামের হাতে। তিনি সম্পর্কে খলিফা উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আপন চাচাতো ভাই।

হিশাম ইবনু আব্দিল মালিক

উমাইয়া সাম্রাজ্যের খলিফা ইয়াজিদ ইবনু আব্দিল মালিকের পর হিশাম ইবনু আব্দিল মালিক খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তার শাসনামলেই জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ। হিশাম ছিলেন দশম উমাইয়া খলিফা। তার শাসনকাল ১৯ বছর—৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বনু উমাইয়ার সবচেয়ে তেজস্বী খলিফা ছিলেন তিনি। তার রক্তের প্রতিটি বিন্দুকণা আরবীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহর পথে জিহাদ ও ইসলামের পরিধি সম্প্রসারণে হিশামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার সৈন্যরা পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত বিজয়কেতন ওড়াতে পেরেছিল। ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে ফরাসিদের কাছে আরব সেনাদের পরাজয়ের পর পশ্চিম দিকে আর সীমানা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। ১২৫ হিজরি তথা ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে হিশাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১]

আল-ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ (দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদ)

হিশামের পর দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদ খলিফা পদে নিযুক্ত হন। তার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, পরকালীন চিন্তার চেয়ে ইহকালীন সুখভোগের প্রতি তার বেশ আগ্রহ। সে ছিল ফাসিক ও আমুদে প্রকৃতির। শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত সারাক্ষণ। বিরোধীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও তাদের ওপর নির্যাতনের কারণে অল্প সময়ের ভেতর সে বহু মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়। তার শাসনকাল ছিল মাত্র এক বছর বা তার চেয়েও কম। অর্থাৎ, ৭৪৩ থেকে ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। ৭৪৪ সনে প্রথম ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ দামেশকে খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হন। তার সেনারা আল-ওয়ালিদকে হত্যা করে।[২]

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৩৫৪

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; , পৃষ্ঠা : ৩-৪

ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ (তৃতীয় ইয়াজিদ)

ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন বেশ দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি জনসাধারণের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের জন্য বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু খলিফা পদের দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মাথায় পরকালে পাড়ি জমান। মৃত্যুর সময় তিনি তার ভাই ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদকে তার উত্তরসূরি মনোনীত করে যান। কিন্তু প্রথম মারওয়ানের নাতি মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ (শাসনকাল : ৭৪৪–৫০ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর দিক থেকে একটি সেনাদল নিয়ে আসেন এবং ৭৪৪ সালের ডিসেম্বরে দামেশকে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এখানে এসেই তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। সেই সাথে তুরস্কের রাজধানী সরিয়ে নেন হারান শহরে। এভাবেই তিনি ইরাকের শাসনক্ষমতা দখল করে নেন। কিন্তু ততদিনে আব্বাসীয় পরিবার খোরাসানে আরও বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের মৃত্যুর পর উমাইয়া সাম্রাজ্য আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি।[১]

আব্বাসীয়দের অনুপ্রবেশ

আব্বাসীয় পরিবার দ্বারা পরিচালিত হাশিমিয়া আন্দোলন উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করে। আব্বাসীয়রা হাশিমি গোত্রের সদস্য। তবে হাশিমিয়া শব্দটি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাতি মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার পুত্র আবু হাশিম থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া এই হাশিমিয়া আন্দলন খোরাসানে তাদের অনুগত লোক খুঁজতে থাকে। ৭৪৬-এর দিকে আবু মুসলিম খোরাসানে হাশিমিয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কালো পতাকার অধীনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এরপর অল্প দিনের মাঝেই সমগ্র খোরাসানের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে চলে আসে। উমাইয়া গভর্নর নাসরকে অপসারণ করে পশ্চিম দিকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। পরের বছর মানে ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কুফা দখল করে নেয় হাশিমিয়ারা। এটা ছিল ইরাকে উমাইয়াদের সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি। তারা ওয়াসিত শহর অবরোধ করে ফেলে এবং সে বছর নভেম্বরে আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। এর ফলে

---

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; , পৃষ্ঠা : ১৬

মারওয়ান তার সেনাদের হারান থেকে ইরাকের দিকে নিয়ে যান। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে দুই বাহিনী 'জাব'-এর যুদ্ধে অংশ নেয় এবং উমাইয়ারা পরাজিত হয়। দামেশক আব্বাসীয়দের হাতে এসে পড়ে এপ্রিলে এবং মারওয়ানকে মিশরে হত্যা করা হয় আগস্টে। আব্বাসীয়রা উমাইয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলে ৮০ জন ক্ষমাগ্রহণ করতে আসে। আসলে এটা ছিল একটা চক্রান্ত। এভাবে তাদেরকে ডেকে এনে সবাইকে একসাথে হত্যা করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। হিশামের এক নাতি প্রথম আব্দুর রহমান আব্বাসীয়দের হাত থেকে বেঁচে যান। তিনি আন্দালুসে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। কর্ডোবায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

তার এই প্রচেষ্টার কারণে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন টিকে ছিল প্রায় ৫০০ বছর। মুসলিম শাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাইফা, বার্বার ও গ্রানাডা। তবে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি কর্ডোবার নাসরি রাজ্যের পতনের মাধ্যমে ইবেরিয়ায় মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটে। গ্রানাডার শেষ মুসলিম শাসক দ্বাদশ মুহাম্মাদ আরাগনের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনেন্ড ও কাস্টিলের রানি প্রথম ইসাবেলার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[১]

আবুল আব্বাস

১৩২ হিজরি তথা ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতের গোড়াপত্তন হয়। প্রথম খলিফা ছিলেন আবুল আব্বাস। তার জন্ম ৭২১ অথবা ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে। তার প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল আব্বাস। আর এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। এছাড়াও তাকে আস-সাফফাহ নামে অভিহিত করা হয়। তার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব উমাইয়া খিলাফতের সমাপ্তি ঘটানো এবং আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা করা। তার শাসনকাল প্রায় পাঁচ বৎসর—৭৪৯ থেকে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৩৬ হিজরি মোতাবেক ৯ই জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বৎসর।[২]

---

[১] *আল-কামিল ফিত তারিখ*, খণ্ড : ৩

[২] *তারিখুল খুলাফা*, ইমাম সুয়ূতি

আবু জাফর আল-মানসুর

আবুল আব্বাসের মৃত্যুর পর আবু জাফর আল-মানসুর খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ৯৫ হিজরি মোতাবেক ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আল-মানসুর সবচেয়ে বেশি ভীতিকর, সাহসী ও দৃঢ় মেজাজের খলিফা হিসেবে পরিচিত। অঢেল সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান ছিলেন তিনি। সাহিত্য, খেলাধুলা ও আইনবিদ্যায় ছিলেন বেশ পারদর্শী। অনেক বনি আদম হত্যা করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের একচ্ছত্র শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করায় মানসুরই তাকে বন্দি করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

মানসুর স্পষ্টভাষী, কৃপণ ও লোভী ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের থেকে অর্ধ সিকি পয়সারও হিসেব নিতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি এক-অষ্টমাংশ পয়সার প্রবর্তন করায় তাকে 'আবুদ দাওয়ানিক' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৩৭ হিজরির সূচনালগ্নে মানসুর খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে প্রথমে আবু মুসলিম খুরাসানিকে হত্যা করেন। ১৪১ হিজরিতে 'মৃত্যুর পর দুনিয়ায় পুনর্জন্ম' মতবাদে বিশ্বাসী একটি ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব হলে তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করেন। সে বছরই তাবারিস্তান[১] খলিফার দখলে চলে আসে।

ইমাম যাহাবি বলেন, '১৪৩ হিজরিতে মানসুর যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের সমবেত করে হাদিস, ফিকহ ও তাফসিরচর্চার প্রতি আহ্বান জানালে আলিমগণ সুবিশাল গবেষণা-গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। তার শাসনামলে আরবি অভিধান, ইতিহাস, রাবিদের[২] জীবনচরিত, সিরাত ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর লিখিত বইয়ের ভান্ডার গড়ে ওঠে।'

১৪৫ হিজরিতে মুহাম্মাদ, ইবরাহিম ও আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনি আবি তালিবের গোটা পরিবার মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি মুহাম্মাদ ও ইবরাহিমকে পরাজিত করে হত্যা করেন। তাদের সাথে অনেক আহলে বাইতও শহিদ হন। এমনকি যেসব আলিম তাদের সঙ্গ দিয়েছেন অথবা সঙ্গ দেওয়ার পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন, তাদের কাউকে হত্যা করেন; আবার কাউকে কারারুদ্ধ করে অমানুষিক

---

[১] দক্ষিণ ইরানের একটি অঞ্চল।

[২] হাদিস বর্ণনাকারীদের রাবি বলা হয়।

নির্যাতন করেন। তখন যারা তার নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম আবু হানিফা, আব্দুল হামিদ ইবনু জাফর, ইবনু আজলান এবং ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। ১৩৬ হিজরি থেকে ১৫৮ হিজরি পর্যন্ত তিনি খলিফার পদে আসীন ছিলেন। ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে হজ্ব উপলক্ষ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

আল-মাহদি

আবু জাফর আল-মানসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মাহদি খলিফা মনোনীত হন। আল-মাহদি ৭৪৪ কিংবা ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় থাকাবস্থায় তিনি খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হন। তার শান্তিপূর্ণ শাসনকালে পূর্বসূরিদের নীতিমালা প্রচলিত ছিল। পূর্বের শাসকদের কারণে বহিঃরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল তা অনেকাংশেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। প্রভাবশালী বারমাকি পরিবার তখন আবারও ক্ষমতার অধিকারী হয়। তারা খলিফার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

আল-মাহদি ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত উজির ইয়াকুব ইবনু দাউদকে কারারুদ্ধ করেন। ১৬৭ হিজরি মোতাবেক ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আল মাহদি কর্তৃক চালু করা এক তদন্তের ফলে অভিযুক্ত ধর্মচ্যুতদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

৭৭৭ সালে তিনি খোরাসানের ইউসুফ ইবনু ইবরাহিমের বিদ্রোহ বশে নিয়ে আসেন। একই বছর তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ঈসা ইবনু মুসাকে সরিয়ে তার পুত্র মুসা আল-হাদিকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন এবং তার জন্য অভিজাতদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। সিরিয়ায় উমাইয়া শক্তির নেতৃত্ব প্রদানকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের বিদ্রোহ দমন করেন ৭৭৮ সালে। ৭৭৫ থেকে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১০ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৬৯ হিজরি সনের মুহাররম মাসে তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়।[২]

---

[১] ইমাম সুয়ূতি রচিত *তারিখুল খুলাফা*

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ২১৪

আল-হাদি

১৬৯ হিজরি তথা ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাহদি মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র আল-হাদি তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার প্রকৃত নাম মুসা। তিনি ছিলেন আল-মাহদির জ্যেষ্ঠ সন্তান। তার জন্ম ১৪৭ হিজরি মোতাবেক ৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার মতো উদার ছিলেন বলে জনসাধারণকে বাগদাদের প্রাসাদে তার সাথে দেখা করার অনুমতি দেন। আব্বাসীয় আমলের অগ্রগতি তিনি বজায় রাখেন। তার স্বল্পকালীন শাসনে বেশ কিছু সামরিক সংঘাত ঘটে। তিনি সেগুলো কঠোর হস্তে দমন করেন। সেই সাথে একটি খারিজি বিদ্রোহও দমন করতে সফল হন তিনি।

মুসা আল-হাদি ১৬৯ হিজরি (৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ১৭০ হিজরি (৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মাত্র এক বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ৭৮৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

হারুনুর রশিদ

হারুনুর রশিদ ছিলেন পঞ্চম আব্বাসীয় খলিফা। ৭৬৩ অথবা ৭৬৬ সালের ১৭ই মার্চ আব্বাসীয় খিলাফতের অধীন 'রাই' নামক অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম হারুন। 'রশিদ' তার উপাধি।

মুসা আল-হাদি মারা যান ১৭০ হিজরির ১৫ই রবিউল আউয়াল জুমআর রাতে। সে রাতেই তার ভাই হারুনুর রশিদ জনগণের বাইআত গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। তিনি আলিম-উলামা, মাজলুম ও গরিব-দুখীদের পাশে থাকতেন সবসময়। হারুনুর রশিদ কেবল একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকই নন; বরং দ্বীনদারি ও আল্লাহভীরুতায় মুসলিমদের আদর্শ। তিনি খলিফা থাকাবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ইহধাম ত্যাগ করেন।

খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনকাল বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। এ সময় ইসলামি শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বাগদাদের বিখ্যাত গ্রন্থাগার 'বাইতুল হিকমাহ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। ইসলামের

---

[১] *আল-আলাম,* খাইরুদ্দিন আয-যারাকলি

ইতিহাসে তার নামটি সোনালি হরফে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ ২৩ বছর শাসনের পর ১৯৩ হিজরি তথা ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে 'তুস' নগরীতে এই মহান খলিফা মৃত্যুবরণ করেন। রাহিমাহুল্লাহ।[১]

সামাজিক অবস্থা

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ দশম উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। হিশামের শাসনকাল ছিল ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর আল-ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ এবং ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। ৭৪৯ সালের দিকে এসে উমাইয়া খিলাফত একেবারে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এরই সুযোগ নিয়ে সেসময় আব্বাসীয় খিলাফতের গোড়াপত্তন হয় এবং আবুল আব্বাস প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। কাজেই এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইবনুল মুবারক উমাইয়া খিলাফতের বিলুপ্তি ও আব্বাসীয় খিলাফতের উত্থানকাল প্রত্যক্ষ করেছেন।

উমাইয়া যুগের সর্বাধিক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল আরব-জাতীয়তাবাদ। পতনকালে এই জাতীয়তাবাদ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। উমাইয়াদের মাঝে আরবপ্রীতি ছিল প্রচণ্ড। আরবপ্রীতির কারণে তারা এমন অনেক বিষয় পুনর্জীবিত করেছে, ইসলাম যেগুলোকে অনেক আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। অবশ্য তারা প্রশংসনীয় কিছু কাজও করেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তাদের এই গুণগুলো দোষে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে তারা অনারবের অধিকার-হরণে লিপ্ত হয়—অথচ শরিয়তে সকল মুসলিমের অধিকার সমান। ইসলামে আরব-অনারবের মাঝে তারতম্যের মাপকাঠি শুধু তাকওয়া। এছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু উমাইয়াগণ অনারবদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিনকে দিন বাড়িয়ে দেয়। এমনকি যুদ্ধলব্ধ গণিমত থেকেও তাদের বঞ্চিত করে। এভাবেই তারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে থাকে।

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৮

দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম হলো—যারা সবসময় অবহেলিত থাকে, তারা সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে বিলম্ব করে না। তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী পারস্যের কিছু অনারব তখন আরবদের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে চলে যায়। জাতীয়তাবাদকেই তারা আরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং, যা ছিল বনু উমাইয়ার সম্মানের কারণ, সেটাই তাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাসী আরবরাও তখন তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শুরু করে।

ফলে উমাইয়াদের পতন-ঘণ্টা বেজে ওঠে। অপরদিকে আব্বাসিদের জন্য ক্ষমতা দখলের পথ সুগম হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আব্বাসিরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা ছিল উমাইয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আমলে আরব জাতীয়তাবাদ চলে যায় একদম আড়ালে। এর পরিবর্তে অনারবদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এসে হাজির হয়। আরবদের মাঝে অনারবদের রীতিনীতি অনুসরণের অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে অনারবদের কৃষ্টি-কালচার সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে।

এমন পরিবেশেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বেড়ে ওঠেন। তিনি হয়তো উমাইয়া যুগে জাহেলি জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং অনারবদের প্রতি অবহেলা অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে ইলম ও তাকওয়ার দিক দিয়ে এমন উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছেন যে, সম্মানের জন্য কখনোই তাকে বংশ, গোত্র কিংবা জাতীয়তার পরিচয় দিতে হয়নি।

উমাইয়া ও আব্বাসি খিলাফতের সময় আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। সেটা হলো—চারিদিকে দ্বীন ও আখলাক-ধ্বংসকারী সরঞ্জাম ও বিনোদন-সামগ্রীর ছড়াছড়ি। তখনকার কতিপয় খলিফা দুনিয়াবি রাজা-বাদশাহদের মতো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ, আনন্দ-ফুর্তি আর অপব্যয়ে মেতে ওঠে। যে বাইতুল মাল ছিল জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, সেটাই তারা ব্যয় করত নিজেদের চাহিদা ও বিলাসিতার পেছনে। আর এসব কাজে তাদের মন্ত্রণা দিত তোষামুদে কবি ও দরবারি। এদের কারও ওপর খলিফা খুশি হলেই বাইতুল মাল থেকে পাওয়া যেত বিপুল পরিমাণ উপহার-উপঢৌকন কিংবা নিয়মিত ভাতা।

আব্বাসি খিলাফতের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না। তবে একটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যেত। উমাইয়া খলিফাগণ আরবপ্রীতি ও তাদের রীতি-রেওয়াজ পালনকে অপরিহার্য মনে করলেও আব্বাসিগণ সেটা করেনি। তারা আরব জাতীয়তাবাদ

ছেড়ে অনারবদের অনুসরণ ও অনুকরণকে নিজেদের জন্য আবশ্যিক করে নেয়। কিন্তু উভয় শাসকগোষ্ঠীই নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এমন সভ্যতা, কৃষ্টি ও বিলাস-বিনোদনের মাঝেই আল্লাহর একদল বান্দা তার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। দ্বীনের দাওয়াত, আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মতৎপরতা ও ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন থেকেছেন। ভোগ ও বিলাসিতার জীবনকে দু-পায়ে ঠেলে দিয়ে দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আশার আলো এবং আলোর মশাল নিয়ে হাজির হয়েছেন সমাজের দিশেহারা মানুষগুলোর সামনে।

সমাজের উল্লিখিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও সে যুগে কল্যাণের ধারাই অধিক বেগবান ছিল। অধিকাংশ মানুষ উন্নতি ও সাফল্যের দিকে ধাবিত হতো। কারণ, প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুগ সম্পর্কে কল্যাণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মানুষের অন্তরে তখন আলিমদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ কাজ করত। আলিমগণও হৃদয় উজাড় করে তাদের ভালোবাসতেন। শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় সত্যকে তুলে ধরতেন। তাদের অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করে যেতেন। ইমাম আওযি, সুফইয়ান আস-সাওরি, ফুযাইল ইবনু ইয়াজ এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক-সহ আরও অনেকের জীবনী এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর।

দুনিয়ার অফুরন্ত সুখ-ঐশ্বর্য এবং অঢেল অর্থসম্পদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে এসে হাজির হয়েছে। অথচ সেসব তিনি ছুঁয়েও দেখেননি। খলিফাদের দরবার ও ধনদৌলতের ব্যাপারে নির্মোহ থেকেছেন সবসময়। দাওয়াতের কাজে, ইলমের প্রচার ও প্রসারে এবং মুসলিমদের কল্যাণকামিতায় তিনি সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন। মানুষের ঈমান ও আমলের ওপর তার এই সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

তৎযুগে জ্ঞানচর্চা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এমন একসময়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, যখন মুসলিম বিশ্বে ইলম ও জ্ঞানচর্চার জোয়ার বইছিল। হাদিস, ফিকহ ও আরবি সাহিত্য তার যৌবনকাল অতিক্রম করছিল। বিভিন্ন জনপদে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ি এবং ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরির মতো জগদ্বিখ্যাত তারকাপুরুষ ইলমের আলো বিকিরণ করে চলছিলেন।

তবে তখন পর্যন্ত ইলম কেবল মৌখিকচর্চা ও দারস-তাদরিসেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইলম সংরক্ষণের মূল এবং একমাত্র মাধ্যম ছিল মানুষের স্মৃতিভান্ডার ও মুখস্থশক্তি। সেসময় বিষয়ভিত্তিক কিতাব কিংবা উল্লেখযোগ্য কোনো সংকলনগ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। তাই শিক্ষার্থীরা দূরদূরান্তে সফর করত। বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে ফিকহ ও হাদিসের ইলম অর্জন করতে হতো। এসব কারণে তখন এই কথাটি লোকমুখে বেশ প্রচলিত ছিল—لَا ثِقَةَ بِعِلْمِ مَنْ لَمْ يَرْحَلْ—অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে সফর করে না, তার ইলমের ওপর আস্থা রাখা যায় না।'

উল্লেখ্য যে, ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর মাঝে এ দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী; অপরদিকে দীর্ঘ ভ্রমণ করা তার অন্যতম অভ্যাস। তিনি হাদিস অন্বেষণে এত বেশি সফর করেছেন যে, ইলমের সাধক ও অভিযাত্রীদের কাছে রীতিমতো প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়ে যান।

এদিকে উমাইয়া শাসনামলে রোম ও পারস্যের বেশ কিছু অঞ্চল মুসলিমরা দখল করে নেয়। ফলে মুসলিমদের মাঝে সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সাধারণ মুসলিমরা তো বটেই; অনেক শিক্ষিত মুসলিমও পারসিক ও রোমীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে। তখন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও খাঁটি ঈমান সংরক্ষণ এবং উম্মাহর ঐক্য ও সুসংহতি বজায় রাখার জন্য একঝাঁক প্রাজ্ঞ আলিমের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন আলিমগণ ইলম ও আকিদা সংরক্ষণের জন্য আবিষ্কার করেন নতুন এক পদ্ধতি। হাদিস ও ফিকহ মুখস্থ করার পাশাপাশি এসব বিষয়ে গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন তারা। এই ধারা উমাইয়া শাসনামলে শুরু হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে আব্বাসীয় আমলে।

এরই অংশ হিসেবে হিজাযের আলিমরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আয়িশা বিনতু আবি বকর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস-সহ আরও অনেক সাহাবি এবং তাবিয়ি ফাতওয়া সংকলন করেন। সেসব ফাতওয়ার ওপর গবেষণা করে সেখান থেকে উদ্ভাবন করা হয় নতুন নতুন মাসআলা।

ইরাকের আলিমগণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহুর আনহুর ফাতওয়া, আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংবিধান, কাজি শুরাইহ-সহ কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফিকহ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করেন। সেগুলোর সাহায্য নিয়ে তারা নিত্যনতুন মাসআলা বের করেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান।

আব্বাসীয় আমলে ফিকহের আঙ্গিকে হাদিস সংকলনের যাত্রা শুরু হয়। বিশিষ্টজনদের মতে, এই প্রক্রিয়াটি সূচনা করেন ইমাম আবু হানিফা। এ বিষয়ে তার ছাত্ররা *কিতাবুল আসার* নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অল্প দিনের মাঝেই তার প্রক্রিয়াটি বেশ জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

একইভাবে ইমাম মালিক নির্মাণ করেছেন তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ *মুআত্তা মালিক*। আরও অনেকেই এ বিষয়ে স্ব-স্ব কিতাবাদি লিখেছেন। হাদিসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ—তথা *বুখারি, মুসলিম, নাসায়ি, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ* ইত্যাদিও একই নিয়মে রচিত। অর্থাৎ, এগুলোতে ফিকহের আঙ্গিকে হাদিস ও অধ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে আরও যারা গ্রন্থ-সংকলনে এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরি[১], ইমাম ইবনু জুরাইজ আল-মাককি[২], ইবনু ইসহাক[৩], মা'মার আল-ইয়ামানি[৪], সাইদ ইবনু আবি আরুবা আল-বাসরি[৫], রাবি ইবনু সাবিহ[৬], সুফইয়ান আস-সাওরি[৭], লাইস ইবনু সাদ[৮], আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক[৯]।[১০]

---

[১] মৃত্যু : ১৩৪ হিজরি

[২] মৃত্যু : ১৫০ হিজরি

[৩] মৃত্যু : ১৫১ হিজরি

[৪] মৃত্যু : ১৫৩ হিজরি

[৫] মৃত্যু : ১৫৬ হিজরি

[৬] মৃত্যু : ১৬০ হিজরি

[৭] মৃত্যু : ১৬১ হিজরি

[৮] মৃত্যু : ১৭৫ হিজরি

[৯] মৃত্যু : ১৮১ হিজরি

[১০] *রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৮৫

ভ্রান্তির অপনোদন

ইলমের প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি তখনকার সময়ে মুতাজিলা[১], খারিজি[২], শিয়া, মুরজিয়া[৩], জাহমিয়া[৪] ইত্যাদি ভ্রান্ত ফিরকার উৎপাত শুরু হয়। সেই সাথে কিছু মানুষ প্রচার করে বেড়ায় মিথ্যা ও বানোয়াট সব হাদিস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আলিমদের বিতর্ক-বাহাস হয়। আলিমগণ বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এসব ভ্রান্তির মূলোৎপাটনে। ইসলামি আকিদা বা বিশ্বাসের মূলেও তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয়। যেমন—তাকদির বলতে কিছু আছে কি না, মানুষের মতো আল্লাহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে কি না ইত্যাদি। মুসলিম বিশ্বে একদল যিন্দিক ও ধর্মচ্যুতের পাশাপাশি উদ্ভট সব মতবাদের আবির্ভাব হয়।

এই ছিল আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সময়কার পরিস্থিতি। আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানি এই যে, তখন ইবনুল মুবারকের মতো মহামনীষীরা জন্মগ্রহণ করেন। তারা মানুষকে সঠিক আকিদা তথা বিশ্বাসের সন্ধান পাইয়ে দেন। ইসলামের স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ রূপরেখা জাতির সামনে তুলে ধরেন। পরিপূর্ণ ইসলামকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম উম্মাহর সাথে কুরআন-সুন্নাহর পরিচয় ঘটাতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৫]

---

[১] একটি ভ্রান্ত দল। মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস প্রণয়নে এরা দলিলের পরিবর্তে বিবেককে প্রাধান্য দিত। ওয়াসিল ইবনু আতা নামের এক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এর গোড়াপত্তন করে।

[২] আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাদের খারেজি বলা হয়। একইভাবে, প্রত্যেক যুগে যারা মুসলিম খলিফার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করেছে, তারাও খারেজি।

[৩]মুরজিয়া হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী একটি দল। তাদের মতে যে ব্যক্তি মন থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি দেয়, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়, যদিও সে স্থায়ীভাবে ফরয আমল ত্যাগ করে, হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং এগুলো হালাল মনে করে।

[৪]এটি একটি ভ্রান্ত দল। তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি অস্বীকার করে। তাদের মতে, আল্লাহর গুণসমূহ চিরন্তন নয়। সেসব নিতান্তই লয়শীল ও অস্থায়ী। সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি যেমন নশ্বর, অস্থায়ী, তেমনই কুরআন এক নশ্বর সৃষ্টি। জান্নাত-জাহান্নামও একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে।

[৫] বিস্তারিত—শাইখ আবু যুহরা রচিত *ইমাম আবু হানিফা*, পৃষ্ঠা : ৮৪

যেভাবে বেড়ে ওঠা

নাম, জন্ম ও বংশ

নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবু আব্দির রহমান। উপাধি শাহানশাহ।[১] পিতার নাম মুবারক। পুরো নাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনি ওয়াযিহ আল-হানযালি আত-তামিমি। ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *আল-মুদহিশ* গ্রন্থে বলেছেন, ইতিহাসের পাতায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক নামে মোট ছয়জন বিখ্যাত মনীষীর নাম পাওয়া যায়। প্রথমজন মারওয়ের, দ্বিতীয়জন খোরাসানের, তৃতীয়জন বুখারার, চতুর্থজন জাওহারের এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠজন বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা যার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করব, তিনি মারওয়ের প্রবাদপুরুষ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ।[২]

জন্ম ও জন্মস্থান

তার জন্মসাল নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে, তিনি ১১৮ হিজরি তথা ৭২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল-সহ বেশ কয়েকজন গবেষক-আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

---

[১] শাহানশাহ অর্থ রাজাধিরাজ। কিন্তু এই নামে কাউকে সম্বোধন করার ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে।

[২] *আল-আলাম*, যারকালি, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ২৫৬

ওপরের মতটিকে প্রাধান্য দেওয়ার অন্যতম কারণ—মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার, তার মৃত্যুসন ১৮১ হিজরি এ ব্যাপারেও কারও দ্বিমত নেই। সে হিসেবে তার জন্মসন ১১৮ হিজরি। অতএব, এটাই গ্রহণযোগ্য মত।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন খোরাসানের মার্ভ শহরে। এ শহরটি ছিল মধ্য এশিয়ার মরূদ্যান ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছাড়াও আরও অনেক মহামানব এই স্বর্ণগর্ভা শহরে জন্মেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, সুফইয়ান আস-সাওরি, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, আবু বকর আল-কফফাল, আবু ইসহাক মাররুযি প্রমুখ। এই মনীষীদের প্রচেষ্টার ফলে এখানকার সাধারণ মানুষরাও দ্বীনদারিতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানে এই শহরটির অবস্থান তুর্কমেনিস্তানের মারি নামক অঞ্চলে।

ইয়াকুত আল-হামায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি ৬১৬ হিজরিতে মার্ভ ছেড়ে চলে আসি। সেখানে তাতারদের আক্রমণ না হলে আমি কোনোদিনও শহরটি ছেড়ে চলে আসতাম না। কারণ, সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। তাছাড়া সেখানে মৌলিক ও উন্নত রচনাবলির প্রাচুর্যও ছিল বেশ ঈর্ষণীয়। আমি যখন ওখান থেকে চলে আসি, তখন সেখানে ১০টি পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরিগুলোর মতো এত বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত লাইব্রেরি আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি। আমার *মুজামুল বুলদান* ও অন্যান্য বইয়ের অধিকাংশ তথ্য এসব লাইব্রেরি থেকেই সংগ্রহ করেছি।[২]

উল্লেখ্য, জন্মশহর মারওয়ের দিকে সম্বন্ধ রেখেই আমাদের প্রিয় ইমামকে ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মাররুযি’ বলে স্মরণ করা হয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শব্দটি ‘মারওয়ি’ হওয়ার কথা থাকলেও অধিক ব্যবহারের ফলে ‘মাররুযি’ হয়ে গিয়েছে। আরবি ভাষায় এমন বেশকিছু নিয়মভঙ্গের অবকাশ রয়েছে।

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৭; *তাহযিবুত তাহযিব,* খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬; *তবাকাতু ইবনি সাদ* : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৭২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২৪৫

[২] *মুজামুল বুলদান,* খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ১৩২-১৩৪

বংশ পরিচয়

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে চলে, সে-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন; সবকিছুর খবর রাখেন।[১]

অতএব, ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি কর্ম; বংশ নয়। জ্ঞানীদের ভাষায়, 'জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো।'

জন্মসূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন বনু হানযালাহ ও বনু আবদু শামসের একজন ক্রীতদাস। অথচ ইলম ও সাধনার দ্বারা একসময় তিনি হয়ে ওঠেন নব দিগন্তের দিশারী; নতুন ইতিহাসের স্থপতি এবং কর্তৃত্বপরায়ণ রাজা-বাদশাহদের চেয়েও অধিক প্রভাবশালী।

সাহাবিদের পরবর্তী যুগে ক্রীতদাসরা ইলমের জগতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। আব্দুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনি আসলাম বলেন, 'আবাদিলা আরবাআ' অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এবং আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমের তিরোধানের পর বিভিন্ন শহরে ইসলামি আইন ও ইলমুল ফিকহের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ক্রীতদাসদের হাতে চলে যায়। তখন মক্কায় আতা ইবনু আবি রাবাহ, ইয়ামামায় ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির, বাসরায় ইমাম হাসান আল-বাসরি, কুফায় ইবরাহিম আন-নাখয়ি এবং খোরাসানে আতা আল-খুরাসানি ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেন।[২]

পিতা-মাতার পরিচয়

প্রায় সকল ইতিহাসবেত্তা এ ব্যাপারে একমত যে, বংশীয় দিক দিয়ে তার বাবা ও মা যথাক্রমে তুর্কি ও খাওয়ারিযমি ছিলেন। জীবনের একপর্যায়ে তার বাবা

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

[২] মুজামুল বুলদান, ইয়াকুত আল-হামায়ি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪১২-৪১৩

ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়ে হামাদান শহরের[১] কোনো এক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাসে পরিণত হন। মালিক তাকে বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। তিনি বেশ আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে তার সব কাজ করতে থাকেন। ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটান। অবসরে একাকী থাকতে ভালোবাসেন। তার এই নিষ্ঠা ও ধার্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে খাওয়ারিযমি বংশোদ্ভূত মালিক তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেন। ইতিহাস এই মহামানব ও মানবীর বিশদ জীবনবৃত্তান্ত ধরে রাখতে না পারলেও তাদের সততা ও দ্বীনদারির বিস্ময়কর একটি ঘটনা আজও সংরক্ষণ করে রেখেছে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেই ঘটনাটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

'হামাদান শহর। চারদিকে শুধু আনার, যায়তুন আর খেজুরের বাগান। সবুজের ছায়াঘেরা এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী প্রথম দেখাতেই যে-কারও নজর কেড়ে নেবে। প্রাচ্যের ধূ-ধূ প্রান্তরে ঠিক যেন এক টুকরো ভূস্বর্গ নেমে এসেছে! শহরের উপকণ্ঠে বেশ বড়সড় একটি বাগানে আপন মনে কাজ করে চলেছে টগবগে এক যুবক। যুবকটির নাম মুবারক। দীর্ঘ শ্মশ্রুর অধিকারী মুবারকের সমগ্র বদনে স্মিত দ্যুতির আভা। অনুপম সততা, সুশ্রী অবয়ব, শান্ত মেজাজ ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অল্প দিনের মাঝেই তিনি বাগান-মালিকের আস্থাভাজনে পরিণত হয়েছেন। একদিন মালিক বাগানে এসে ডাকলেন—

'মুবারক, এখানে একটু আসো তো।'

'জি হুজুর! কিছু লাগবে আপনার?'

'আজকে ভালোই গরম পড়েছে। আমার গলাটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটা আনার নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি।'

'জি আচ্ছা!'

বাগানের দিকে ছুটল মুবারক। সুন্দর দেখে একটা আনার নিয়ে মালিকের সামনে হাজির হলো সে। খোসা ছাড়িয়ে দানা মুখে দিতেই ভদ্রলোক ভ্রু কুঁচকিয়ে বললেন, 'একি, তুমি তো দেখছি বাগানের সবচেয়ে টক ফলটাই আমায় ধরিয়ে দিলে!'

'মাফ করবেন হুজুর। ভুল হয়ে গেছে আমার।'

---

[১] এটি ইরানের হামাদান প্রদেশের রাজধানী শহর। তেহরান থেকে প্রায় ৩৬০ কিলোমিটার (২২৪ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

'ঠিক আছে, যাও আরেকটা নিয়ে আসো।'

খানিক বাদে ফিরে এলো মুবারক। চোখেমুখে এবার কিছুটা স্বস্তি। সারা বাগানে তল্লাশি চালিয়ে সে টকটকে লাল একটি আনার নিয়ে এসেছে। মালিক কিছু দানা মুখের ভেতর চালান করে দিলেন। মুবারক চেয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'এটা কী আনলে তুমি? ইয়ার্কি করছ আমার সাথে?' মালিকের কণ্ঠে ক্ষোভ।

'কেন হুজুর কী হয়েছে?'

'যত্তসব! এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন?' চেঁচিয়ে উঠলেন মালিক।

মুবারক এক দৌড়ে বাগানের মাঝে হারিয়ে গেল। এবার বেশ বড়সড় একটি আনার নিয়ে ফিরল সে। করুণ চেহারায় মালিকের দিকে এগিয়ে দিল সেটি...

'দাও দেখি, এবার কেমন আনার আনলে?'

মুবারক ঘামছে। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে। এই বুঝি মালিক ক্ষেপে উঠবেন।

'আচ্ছা, তুমি কি ইচ্ছে করেই এমনটা করছ?' চোখমুখ শক্ত করে বললেন মালিক।

'এই গোলাম আপনাকে কষ্ট দেবে কোন সাহসে, হুজুর?' ফ্যাকাশে চেহারায় বলল মুবারক।

'তিন তিনবার কেন হয়রানি করলে আমায়! তুমি তো দেখছি বাগানের ফল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই রাখো না! সারা দিন করো কী?' বড় বড় চোখ করে বললেন মালিক।

'বিশ্বাস করুন, আমি....।' কথা শেষ করতে পারল না মুবারক। মালিক বলে উঠলেন—

'বাগানের ফল খাওনি কখনো?'

'জি না।'

অবাক হলেন মালিক। মুহূর্তেই তার চেহারার গুমোট অন্ধকারভাব সরে গেল।

'খাওনি কেন?'

'আমাকে বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; ফল খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

মালিক 'থ' হয়ে গেলেন। নির্বাক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ মুবারকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। ভৃত্যের এমন সততা ও স্বচ্ছতা দেখে তার চোখের কোণে অশ্রু জমে গেল। মুবারকের মাথাটা কাছে টেনে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'এসবে অনুমতি লাগে না, বাবা!'

এই ঘটনার পর যুবক মুবারকের জন্য তার মনে বিশেষ একটি স্থান তৈরি হয়। তিনি তার কাজের চাপ কিছুটা কমিয়ে দেন। তাকে পরিবারের একজন মনে করতে শুরু করেন। তার একটি বিয়ের উপযুক্ত কন্যা ছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে তার ব্যাপারে প্রস্তাব আসত। কিন্তু কেন যেন কোথাও তার মন সায় দিচ্ছিল না। এরই মাঝে একদিন তিনি মুবারককে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা বলো তো, মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র কে হতে পারে?'

মুবারক বলে, 'জাহেলি যুগে সাধারণ মানুষ বংশমর্যাদা দেখে বিয়ে দিত। ইয়াহুদিরা দেখত অর্থসম্পদ। খ্রিস্টানরা সৌন্দর্য। আর এই উম্মাত দেখে দ্বীনদারি।'

মুবারকের এমন প্রজ্ঞাময় উত্তর শুনে মালিক ভীষণ মুগ্ধ হন। তিনি বিষয়টি তার স্ত্রীকে জানিয়ে বলেন, 'মেয়ের জন্য মুবারকের চেয়ে যোগ্য আর কাউকে দেখছি না আমি।'

তারপর তাদের দুজনের সম্মতিতে তার কন্যার সাথে মুবারকের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ঘরেই জন্ম নেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, বিখ্যাত ফকিহ ও বীর সৈনিক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ।[১]

উল্লেখ্য, কেবল দ্বীনদারি দেখে আদরের কন্যাকে এক নগণ্য ভৃত্যের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি মা-বাবার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। অধিকন্তু পরিবারের গোলামকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়াও একটা মেয়ের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়। বাবা-মা ও মেয়ের এমন অভূতপূর্ব ত্যাগ এবং ভৃত্যের পূর্ণ নিষ্ঠা ও সততার প্রতিদান হিসেবে মহান আল্লাহ তাদের দান করেন সোনার টুকরো এক সন্তান—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক—যিনি দীপ্ত প্রতিভা, অসীম বীরত্ব ও অনুপম চারিত্রিক স্বচ্ছতায় পূর্ববর্তী লোকদেরও ছাড়িয়ে যান।

---

[১] *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, ইবনু খাল্লিকান, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৩৭; *শাযারাতুয যাহাব*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৯৬

এই ঘটনার বাইরে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পিতা-মাতা সম্পর্কে আবু তুমায়লা ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আজিজের দুটি ভাষ্য ছাড়া তেমন কিছুই জানা যায় না। আবু তুমায়লা বলেন, 'আমার ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বাবা একসঙ্গো ব্যবসা করেছেন।'[১]

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আজিজ বর্ণনা করেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বাবাকে লক্ষ্য করে ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'আব্দুল্লাহর মা পরিপূর্ণরূপে আপনার আমানত রক্ষা করেছেন!' অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক দেখতে অবিকল তার বাবার মতো ছিলেন।[২]
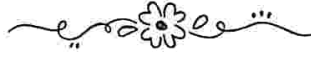
[১] তাহযিবুত তাহযিব, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ২৯৪

[২] তারিখু বাগদাদ, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৩

শিক্ষার আসরে

শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষা

বাল্যকাল থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। বোল ফুটতেই তিনি স্থানীয় মক্তবে আসা-যাওয়া শুরু করেন। সেখানেই তার জ্ঞানচর্চার হাতেখড়ি। পবিত্র কুরআন-সহ অন্যান্য বিষয়ের বুনিয়াদি শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। তখন থেকেই তার মাঝে সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়। নিচের ঘটনাটি সে দিকেই ইঙ্গিত করে—

খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এক বাল্যবন্ধু বলেন, 'একদিন আমি আর আব্দুল্লাহ মক্তব থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ দেখি, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক লোক বক্তৃতা দিচ্ছে। লোকটির দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হলে আব্দুল্লাহ আমাকে বলতে লাগল, জানিস, লোকটা এতক্ষণ যা যা বলল, সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে! কথাটি পাশের এক লোকের কানে গেলে সে বলে ওঠে, আচ্ছা, শোনাও তো দেখি। ইবনুল মুবারক তখন পুরো ভাষণটি হুবহু শুনিয়ে দিলো! এতে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে গেল।'[১]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৫

আলো-আঁধারের খেলা

তবে খুব বেশিদিন এভাবে কাটেনি। হঠাৎ করেই কীভাবে যেন কিশোর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জীবনে নেমে আসে আঁধারের কালো ছায়া। মক্তবের গণ্ডি পেরুতেই ধূর্ত শয়তান তাকে ফাঁদে ফেলে দেয়। অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তিনি জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেন। ধীরে ধীরে কুরআনের তালিম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। গান-বাদ্যে মত্ত হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে পেয়ে বসে মদ ও নারীর নেশা। জীবনের গতিপথ হয়তো এমনই। কীভাবে যেন সহসাই সবকিছু পাল্টে যায়!

ইবনুল মুবারকের এই বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার সঙ্গী-সাথি ও বন্ধু-বান্ধব। অনেক শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের ছেলেরাও সঙ্গদোষে বিগড়ে যায়। আবার অনেক সাধারণ বংশের ছেলেরাও সৎসঙ্গ পেয়ে সততা, রুচিবোধ ও উন্নত মানসিকতা লাভ করে। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিজের সুপ্ত প্রতিভা ও অমিত সম্ভাবনার বিষয়টি জানার আগেই সমাজের কিছু বিপথগামী ছেলের পাল্লায় পড়ে বখে যান তিনি।

কিন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া অফুরান। অনুগ্রহ অপরিমিত। তিনি চাইলে সহসাই বান্দাকে পাপের স্তূপ থেকে টেনে তুলতে পারেন। পথের মরীচিকা দূর করে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর অকস্মাৎ জীবনের বাঁক পরিবর্তন থেকে আমাদের এমনটিই মনে হয়। তার পাপের জগতে প্রবেশ যতটা অস্বাভাবিক ছিল, ফিরে আসার ঘটনা ছিল তারচেয়েও অনেক বেশি অভাবিত! শয়তানের রচিত ফাঁদ থেকে স্বয়ং আল্লাহই তাকে উদ্ধার করেন, জীবনের চোরাবালি থেকে টেনে তোলেন। অন্ধকার থেকে নিয়ে আসেন আলোকিত পথে।

চলুন এবার ইবনুল মুবারকের মুখ থেকেই এমন অভাবিত প্রত্যাবর্তনের গল্পটি[১] শোনা যাক। তিনি বলেন—

একবার আমি বন্ধুদের সাথে একটি বাগানে রাত কাটাচ্ছি। খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হতে হতে রাত গভীর হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে গানবাদ্যও চলে। রাতের প্রায় শেষপ্রহরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আমি নিজেও ঘুমিয়ে পড়ি। সে রাতে আমি অদ্ভুত

[১] একবার ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইবনুল মুবারককে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার প্রত্যাবর্তনের গল্পটি আমাদের শোনাও। তখন তিনি এই গল্পটি বলেন।

একটি স্বপ্ন দেখি—যে গাছটির নিচে আমি ঘুমাচ্ছি, সে গাছেরই একটি ডালে সুন্দর একটি পাখি বসে আছে। পাখিটি আপন মনে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে যাচ্ছে—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। আর তাদের বেশির ভাগই সত্যত্যাগী।[১]

সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি তখন অবচেতনেই বলে উঠি, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহর পথে ফিরে আসার সময় হয়েছে।' এরপর উঠে গিয়ে ঢোল-তবলা-সহ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলি এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসি।'[২] কোনো কোনো বর্ণনামতে, তার হাতে থাকা বাদ্যযন্ত্রটি বেজে ওঠে এবং সেখান থেকেই ওপরের আয়াতটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তার প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ছিল এমন—

যুবক বয়সে তিনি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। মেয়েটিও তাকে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসে। দিনদিন তাদের ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। সীমাহীন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তাদের দিনগুলো কেটে যায়। এরই মাঝে শীতের এক রাতে তারা পত্রবিনিময় করে। রাত জেগে নিজেদের প্রেমানুভূতি ব্যক্ত করতে শুরু করে; মনের না-বলা কথাগুলো লেখনীতে ফুটিয়ে তোলে। দুজন যখন গভীর ভাবাবেগে হারিয়ে যায়, ঠিক তখনই মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আযানের সুমধুর সুর—'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার...'

---

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ১৬

[২] *আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ,* ইমাম লাখনভি, পৃষ্ঠা : ১০২

রবের পক্ষ থেকে আসা শাশ্বত সত্যের আহ্বানে দুজনের হৃদয় সহসাই কেঁপে ওঠে। পাপে নিমজ্জিত অন্তরে শিহরন জাগে। সঙ্গে সঙ্গে তারা খাঁটি মনে তাওবা করে ফিরে আসেন আল্লাহর পথে।[১]

প্রত্যাবর্তন

বিজ্ঞানী নিউটনের গতিসূত্র থেকে জানা যায়, একটা বল যত জোরে দেওয়ালে ছুড়ে মারা হবে, ঠিক ততটাই দ্রুত বেগে সেটা ফিরে আসবে। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই। মক্তবের পাঠ চুকিয়ে তিনি যত দ্রুত পাপের জগতে মিশে গিয়েছিলেন, সত্য খুঁজে পেয়ে তারচেয়েও প্রবল বেগে শিক্ষা ও ধার্মিকতায় ফিরে এসেছিলেন এবং এ দুটি শাখায় সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

২৩ বছর বয়সে তিনি দ্বীনের পথে ফিরে আসেন। তখন ১৪১ হিজরি সাল। কোনো কোনো বর্ণনামতে, তিনি কুড়িতেই পেয়ে যান সত্যের সন্ধান। সাধারণত সালাফদের কেউ এত দেরিতে পড়াশোনায় শুরু করতেন না; খুব অল্প বয়সেই তারা শরিয়তের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলতেন।

যাহোক, প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রথমে আরবি ব্যাকরণ এবং ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এরপর হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জনে তৎকালীন বিশিষ্ট ফকিহ ও হাদিসবেত্তাদের নিকট যাতায়াত শুরু করেন। সেই সাথে ব্যবসাও চালিয়ে যান সমানতালে। ব্যবসা করার এই অনুপ্রেরণা তিনি সম্ভবত তার শ্রদ্ধেয় পিতা কিংবা প্রিয় শাইখ ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কারণ, তারা উভয়েই ব্যবসাকে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

তাছাড়া ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের এটাও একটা কারণ হতে পারে যে, তিনি তার ইলমকে 'ইনকাম সোর্স' বা 'অর্থ উপার্জনের মাধ্যম' হিসেবে নেননি; বরং শাসকশ্রেণি ও বিত্তশালীদের উপহার-উপঢৌকন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। এই উন্নত মানসিকতা ও চেতনার বলেই তিনি প্রখ্যাত আলিম হবার পাশাপাশি একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পেরেছিলেন।

---

[১] *কুনযুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা* : ৮৪

উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবন

আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ

সুমহান রব আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জন্য জ্ঞানার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সহজ করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তাকে দান করেছেন জগদ্বিখ্যাত আলিমদের সান্নিধ্যে থাকার অবারিত সুযোগ এবং কালজয়ী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার অসামান্য যোগ্যতা, অপূর্ব ধীশক্তি ও অতুলনীয় সহনশীলতা। এ কারণে তিনি একবার শুনেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বক্তৃতা মুখস্থ করে ফেলতেন। মাত্র একবার দেখেই কঠিন থেকে কঠিনতর রচনা কিংবা গবেষণাপত্র আত্মস্থ করতে পারতেন। কখনো অনাহারে, কখনো বা অর্ধাহারে স্রেফ ইলমের জন্য তিনি ঘুরে বেড়াতেন দেশ থেকে দেশান্তরে। যেখানেই কোনো মুহাদ্দিস কিংবা ফকিহর সন্ধান পেতেন, সেখানেই ছুটে যেতেন তার ঘোড়া হাঁকিয়ে। হাদিস ও ফিকহের পাশাপাশি আহরণ করতেন হাজারো অমিয় বাণী।

তার এই কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও কঠোর পরিশ্রমের কাজটি সহজ করে দিয়েছে তার পেশা। যেহেতু তিনি ব্যবসায়ী, তাই ব্যাবসায়িক কাজের সুবাদে প্রায়ই তাকে দূরদূরান্তে গমন করতে হতো। এতে সেখানকার যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের সাক্ষাৎ পেতেন তিনি। বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের সাথে পরিচয় হতো এবং তাদের থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন। সেসকল মানুষের জ্ঞানসরোবরে অবগাহন করে তিনি ক্রমশ সমৃদ্ধ করেছেন তার ইলমের ভান্ডার। ইলমের জন্য তার এই অনির্বাণ তৃষ্ণা ও দূরদূরান্তে ভ্রমণের কথা জীবনীগ্রন্থগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্ব ও বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইলমুল হাদিস অন্বেষণে সমগ্র পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ ভ্রমণ করেছেন। তখনকার ইলমের প্রাণকেন্দ্রগুলো[১] চষে বেড়িয়েছেন।'[২]

আবু উসামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার জানামতে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো আর কেউ ইলমের জন্য এত বেশি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানিনি।'[৩]

যাকারিয়া ইবনু আদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, হাদিসের খোঁজে ভ্রমণের জন্যে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৪]

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের উদাহরণ তিনি নিজেই। তার যুগে কেউ তার মতো করে ইলম তালাশ করেননি। ইয়ামান, মিসর, শাম, বাসরা ও কুফা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে হাদিস শুনিয়েছেন। হাদিস বর্ণনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঠিক একইভাবে ছোট-বড় সবার কাছ থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইলমের আদব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি ও আবু ইসহাক আল-ফাযারির কাছ থেকেও হাদিস সংগ্রহ করেছেন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সুবিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন।'[৫]

জনশ্রুতি আছে, একবার ইবনুল মুবারকের ছেলে মারা গেলে এক অগ্নিপূজারি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'শোকের মুহূর্তে জ্ঞানী ব্যক্তির ঠিক তা-ই করা উচিত যা একজন মূর্খ এক সপ্তাহ পরে করে থাকে।' এ কথা শোনামাত্রই তিনি শোকতাপ ঝেড়ে ফেলে উপস্থিত লোকদের বলেন, 'তোমরা কথাটি লিখে রাখো।'[৬]

---

[১] যেমন—ইয়ামান, মিসর, শাম, জাযিরাহ, বাসরা, কুফা ইত্যাদি।

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, ইবনু আবি হাতিম আর-রাযি, পৃষ্ঠা : ২৬৪

[৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৪

[৪] *আর রিহলাতু ফি তলাবিল হাদিস*, খতিব বাগদাদি, পৃষ্ঠা : ৯০

[৫] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৪

[৬] *ফাইযুল কাদির*, মানাওয়ি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৩০

এ কথার ওপর ভিত্তি করেই তিনি বলতেন, 'কারও জীবনে যখন কোনো বিপদ নেমে আসে, তখন তার ঠিক তা-ই করা উচিত, যা সে পাঁচ দিন পরে করবে।'

অর্থাৎ, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্ট যত তীব্রই হোক না কেন—সময়ের ব্যবধানে তাতে একসময় বিস্মৃতি ও সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ে যায়। জীবন আবার আগের মতো সুষম গতিতে প্রবাহিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। এটাই প্রকৃতি। কাজেই রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে মুষড়ে না পড়ে শোকরগুজার হতে হবে। নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম যথাযথভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সাময়িক কষ্টকে আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা মনে করতে হবে। এতে মহান আল্লাহর তাকদির ও সিদ্ধান্তে আমাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ পাবে। তিনিও আমাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করবেন।[১]

বিস্ময়কর ইলমি সফর

একবার তিনি হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহর একটি বাণী সনদ-সহকারে শোনার জন্য জন্মশহর মার্ভ থেকে সুদূর রাই শহরে সফর করেন। তার সেই অমূল্য বাণীটি হচ্ছে—

> তুমি একজনের শত্রুতার বিনিময়ে হাজার জনের বন্ধুত্ব ক্রয় করো না।

অর্থাৎ, এক হাজার মানুষকে খুশি করতে গিয়ে যদি একজন মানুষকে বিনা কারণে কষ্ট দিতে হয়, তবে সেটা তুমি করো না।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হারুন ইবনুল মুগিরাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ একবার আমার বাড়িতে আসেন এবং বাহন থেকে না নেমেই আমাকে ওপরের উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি উক্তিটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, সরাসরি আপনার মুখ থেকে এই কথাটি শোনার জন্যই আমি মার্ভ থেকে এত দূর এসেছি। এ কথা বলেই তিনি বাহন ছুটিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যান।'[২]

প্রসঙ্গত, মার্ভ থেকে রাই শহরের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একটি মাত্র বাণী শোনার জন্য এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। পাড়ি দিয়েছেন উত্তপ্ত মরু, দুর্গম পাহাড় ও বিপদ-সংকুল বনাঞ্চল। সূর্য

---

[১] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ১৬৬

[২] *আর রিহলাতু ফি তলাবিল হাদিস*, খতিব বাগদাদি, পৃষ্ঠা : ১৫৬

যখন মরু বুকে আগুন ঝরাচ্ছে, বালু যখন তপ্ত হয়ে তাপ ছড়াচ্ছে এবং পাহাড় ও বনেজঙ্গলে যখন হিংস্র পশুরা ওত পেতে রয়েছে, ঠিক তখনই হাদিসের ভালোবাসায় অবিরাম উট হাঁকিয়ে চলছেন একজন আলিম—এক মুহূর্তের জন্য দৃশ্যটি কল্পনা করুন তো। অবশ্য এসির ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে সেই মরু-পাহাড় ও খরতাপের কথা কল্পনা করাও বেশ কঠিন। আল্লাহ তার প্রতি এবং তার মতো অন্যদের প্রতি রহম করুন। কবি ঠিকই বলেছেন—

তারাই মোদের পূর্বসূরি—যাদের নিয়ে গর্ব করি

কোন মুখেতে করো বড়াই? লও তো দেখি তাদের জুড়ি!

তাদের এই অনন্য ত্যাগ ও অদম্য আগ্রহের কল্যাণেই ইলম ও হাদিসের সুবিশাল ভান্ডার আজও সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সুরক্ষিত রয়েছে।

অর্জিত ইলম লিপিবন্ধকরণ

তিনি অর্জিত ইলম লিপিবন্ধ করার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। জ্ঞানমূলক যেকোনো বিষয় জানার সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখার চেষ্টা করতেন। তার এই সযত্ন চেষ্টা ও লিখনপ্রবণতা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'শাইখ, আপনি আর কতকাল ধরে লিখে যাবেন?' উত্তরে তিনি বলতেন, 'যে শব্দটি আমার উপকারে আসবে তা বোধহয় এখনো লেখা হয়নি।'[১] তিনি আরও বলতেন, 'কাপড়ে কালির দাগ আলিমদের সৌভাগ্যতিলক ও সুগন্ধিবিশেষ।'[২]

লেখার প্রতি তিনি অদম্য আগ্রহ পোষণ করতেন। সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। আর এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তিনি স্মৃতির চেয়ে কাগজের পাতায় বেশি আস্থা রাখতেন; মুখের কথার চেয়ে কলমের কালিতে বেশি ভরসা করতেন। সিনদি ইবনু হারুন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনুল মুবারকের সঙ্গে মুহাদ্দিসগণের নিকট যাওয়া-আসা করতাম। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আমরা কার কাছ থেকে ইলম শিখব? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমাদের ও পূর্ববর্তীদের রচিত কিতাব ও বইপুস্তক থেকে।'[৩]

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৮০

[২] *আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসলিমলা*, পৃষ্ঠা : ১৪৯

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, আবু নুআইম, খণ্ড : ৮ম; পৃষ্ঠা : ১৫৬

তিনি দিনের বড় একটা অংশ হাদিস শ্রবণ ও সংকলনে নিমগ্ন থাকতেন। শিক্ষকদের সম্মান ও ইলমের আদব রক্ষা করে চলতেন। তার এই নিমগ্নতা ও সেবাপরায়ণতা দেখে শিক্ষকরাও অবাক হয়ে যেতেন। তার প্রিয় শাইখ ঈসা ইবনু ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রোম দেশে ছিলাম। তখন তিনি আমার এত বেশি সেবা-শুশ্রূষা করেন যে, আমি রীতিমতো লজ্জায় পড়ে যাই। তিনি সবসময় আমার উটনীর লাগাম ধরে পথ চলতেন। কোনো মানজিলে অবতরণ করলে আমার জন্য খেজুর ও ঘি দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন নিয়ে আসতেন। এরপর মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন। খাওয়া শেষ হলে সম্মানজনক আসনে বসাতেন। এরপর বিনয়ের সাথে হাদিস জিজ্ঞেস করতেন। আমি হাদিস বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলো লিখে ফেলতেন। তার এমন চমৎকার আদব-আখলাক দেখে আমি তাকে বলতাম, 'শাইখ আমার, আর কত শিখবেন? এখনো কি আপনার পরিতৃপ্ত হওয়ার সময় আসেনি?' তিনি বলতেন, 'শিক্ষা তৃপ্তি নয়, তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়!'

নিভৃত অধ্যয়ন

ইলমের জন্য অত্যধিক সফরের কথা শুনে কারও মনে হতে পারে, তিনি বোধহয়, ঘরে বসে কখনো ইলমচর্চা করতেন না। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এমন নয়। তিনি সফরের আগে ও পরে ঘরে বসেই পড়াশোনা করতেন। বরং বলা যায়, আবদ্ধ ঘরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একটানা জ্ঞানচর্চাই ছিল তার প্রধান নেশা। তিনি এই নিভৃত অধ্যয়নে এত বেশি তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন যে, কখনো একাকিত্ব অনুভব করতেন না।

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ সময় ধরে তার বন্ধ কুটিরে থাকতেন।' একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'এই নির্জন কুটিরে আপনার একা একা লাগে না?' উত্তরে তিনি বলেন, 'একা একা লাগবে কেন? আমার তো বরং এটা মনে হয় যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রিয় সাহাবিদের সাথেই আছি।'[১]

আরেকবার তাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুটা রাগত স্বরে বলে ওঠেন, 'কে বলেছে আমি একা একা থাকি? আমি নবি-রাসুল, ওলি-আউলিয়া আর সাহাবিদের সাথে সময় কাটাই।'

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৪

প্রসিদ্ধি লাভ

এক কথায়, ইলমচর্চা তার ধ্যানে পরিণত হয়েছিল। আমৃত্যু তিনি এই ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। মৃত্যুর আগে আমাদের সতর্ক করে বলে গেছেন, একজন মানুষকে ততক্ষণ আলিম বলা চলে, যতক্ষণ সে ইলমচর্চায় নিরত থাকে। আর যখন সে ইলমের পরিপূর্ণতা অনুভব করে এবং নিজেকে আলিম ভাবতে শুরু করে, তখন সে মূর্খদের কাতারে নেমে আসে।'[১]

বস্তুত ইলমের প্রতি গভীর অনুরাগ, অদম্য ইচ্ছা ও দেশ-দেশান্তরে অনবরত ইলমি সফরের কল্যাণে খুব সহজেই তিনি সমকালীন আলিম, ফকিহ ও জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। বসত গাড়েন তাদের সকলের হৃদয়রাজ্যে। পরিচিত-অপরিচিত সকলেই তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

আহমাদ ইবনু সিনান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক হাম্মাদ ইবনু যায়িদের নিকট উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'খোরাসান।'

'খোরাসানের কোন এলাকা?'

'মার্ভ শহর।'

'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক নামে কাউকে চেনো?'

'জি, চিনি।'

'তিনি এখন কী করেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলছেন!'

এ কথা শুনে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ চমকে ওঠেন। তাকে স্বাগত জানান। বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং যথাযথ সম্মান ও আতিথেয়তা করেন।'[২]

---

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫৯

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল, পৃষ্ঠা* : ১৬৭; *তারিখু বাগদাদ,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৪

আরেকবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহর নিকট গমন করেন। অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয়ে আলোচনা করেন। তার আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে ইবনু জুরাইজ জানতে চান, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' উত্তরে ইবনুল মুবারক বলেন, 'খোরাসান।' তখন ইবনু জুরাইজ মন্তব্য করেন, 'আমি কখনো ধারণাও করিনি যে, খোরাসানের মাটিতে তোমার মতো মানুষের জন্ম হতে পারে!' এ কথা বলে তিনি ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপিগুলো ইবনুল মুবারকের হাতে তুলে দেন।[১]

অনন্য প্রতিভা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে আলিম, ফকিহ, মুহাদ্দিস, যাহিদ, মুজাহিদ, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ। নবি-রাসুলগণ ব্যতীত অন্য কারও মাঝে এতসব গুণের সমাবেশ খুঁজে পাওয়া একেবারেই বিরল ঘটনা। ইতিহাসের পাতায় এমন মানুষ খুব একটা পাওয়া যায় না—যারা ভিন্নমুখী একাধিক বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেছেন, দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন; আবার জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, পূর্ণমাত্রায় যুহদ ও আত্মসংযমচর্চা করেছেন এবং এতসব ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও হয়ে উঠেছেন একজন সফল ব্যবসায়ী।

এজন্যই ইসলামের ইতিহাসে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এক মুগ্ধতার নাম। ইতিহাস তাকে বিভিন্ন নামে স্মরণ রেখেছে। মুহাদ্দিসগণ মুহাদ্দিস হিসেবে, ফকিহগণ ফকিহ হিসেবে আর মুজাহিদগণ মুজাহিদ হিসেবে। সুফিগণ সুফি হিসেবে এবং ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ী হিসেবে। এক কথায়, সবাই তাকে নিয়ে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে গর্ব করেন।

আব্বাস ইবনু মুসআব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর মাঝে হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য, বীরত্ব, ব্যবসা, উদারতা ও দানশীলতা-সহ যাবতীয় চারিত্রিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণের সমাহার ঘটেছিল।'[২]

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ১৬৪

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৫; *তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত*, ইমাম নাওয়াওয়ি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮৫

আবু দাউদ আত-তয়ালিসি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারকের মতো প্রতিভাবান মানুষ দেখিনি। তিনি একাধারে ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।'[১]

হাসান ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার একদল ছাত্র সিদ্ধান্ত নিল, তারা ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর পাঠদান, লেনদেন, সৌজন্যবোধ ও সামাজিকতা পর্যালোচনা করে তার যাবতীয় গুণ ও প্রতিভা সকলের সামনে নিয়ে আসবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা যে গুণগুলো সামনে আনতে পেরেছিল তা নিচে দেওয়া হলো—**এক.** হাদিস। **দুই.** ফিকহ। **তিন.** সাহিত্য। **চার.** আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র। **পাঁচ.** গদ্য। **ছয়.** অলংকারশাস্ত্র। **সাত.** বীরত্ব। **আট.** ব্যবসা। **নয়.** উদারতা ও দানশীলতা। **দশ.** তাকওয়া। **এগারো.** দুনিয়াবিমুখতা। **বারো.** আত্মোন্নয়ন। **তেরো.** ন্যায়নীতি। **চৌদ্দ.** রাত্রিকালীন ইবাদত। **পনেরো.** নফল সালাত। **ষোলো.** হজ। **সতেরো.** জিহাদ। **আঠারো.** অনর্থক কার্যকলাপ পরিত্যাগ। **উনিশ.** দৃঢ়তা। এবং **বিশ.** সমসাময়িক ও ছাত্রদের সঙ্গে মতবিরোধের অপ্রতুলতা।[২]

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৪

[২] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৫৪

যাদের পরশে ধন্য তিনি

হাদিসের বিশিষ্ট উস্তাযগণ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর শিক্ষকের সংখ্যা অগণিত। আব্বাস ইবনু মুসআব রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আমি ইবরাহিম ইবনু ইসহাকের সূত্রে জেনেছি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি প্রায় চার হাজার মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদিস শিখেছি। তাদের মধ্যে এক হাজার জনের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছি।' এরপর আব্বাস ইবনু মুসআব বলেন, 'এই এক হাজারের মধ্য থেকে আটশো জনের হাদিস আমার ভাগ্যে জুটেছে।'[১]

বিখ্যাত জীবনীকারগণ স্ব-স্ব গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বিশিষ্ট উস্তাযদের দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন। সেসবের *তাহযিবুত তাহযিব* গ্রন্থের তালিকাটি আমাদের কাছে সবচেয়ে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে। তাই নিচে তালিকাটি হুবহু তুলে ধরছি—

১. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ২. ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ, ৩. ইমাম শুবা রাহিমাহুল্লাহ, ৪. ইমাম আওযায়ি রাহিমাহুল্লাহ, ৫. ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ, ৬. লাইস ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ, ৭. ইকরামা ইবনু আম্মার রাহিমাহুল্লাহ, ৮. ঈসা ইবনু তাহমান রাহিমাহুল্লাহ, ৯. ফিতর ইবনু খলিফা রাহিমাহুল্লাহ, ১০. মুহাম্মাদ ইবনু আজলান রাহিমাহুল্লাহ, ১১. মুসা ইবনু

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃষ্ঠা : ২৫৫

উকবা রাহিমাহুল্লাহ, ১২. ইবরাহিম ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ, ১৩. সুলাইমান আল-আমাশ রাহিমাহুল্লাহ, ১৪. হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ, ১৫. সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ, ১৬. ইবনু আবি যিব রাহিমাহুল্লাহ, ১৭. ইবরাহিম ইবনু তাহমান রাহিমাহুল্লাহ, ১৮. ইবরাহিম ইবনু নাশিত রাহিমাহুল্লাহ, ১৯. আবু বুরদাহ বুরাইদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আবি বুরদাহ রাহিমাহুল্লাহ, ২০. হুসাইন আল-মুআল্লিম রাহিমাহুল্লাহ, ২১. হাইওয়া ইবনু শুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ ২২. খালিদ ইবনু সাইদ আল-আমাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ২৩. খালিদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনি বকর আস-সুলামি রাহিমাহুল্লাহ, ২৪. যাকারিয়া ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ, ২৫. যাকারিয়া ইবনু আবি যা-ইদা রাহিমাহুল্লাহ, ২৬. সাইদ ইবনু আবি আরুবা রাহিমাহুল্লাহ, ২৭. সাইদ ইবনু আবি আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ, ২৮. আবু শুজা রাহিমাহুল্লাহ, ২৯. সাইদ ইবনু ইয়াজিদ আল-কাতবানি রাহিমাহুল্লাহ, ৩০. সাইদ ইবনু ইয়াস আল-জারিরি রাহিমাহুল্লাহ, ৩১. সালাম ইবনু আবি মুতি রাহিমাহুল্লাহ, ৩২. সালিহ ইবনু সালিহ ইবনি হাই রাহিমাহুল্লাহ, ৩৩. তালহা ইবনু আবি সাইদ রাহিমাহুল্লাহ, ৩৪. আব্দুল মালিক ইবনু আবি সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ, ৩৫. উমার ইবনু যর রাহিমাহুল্লাহ, ৩৬. উমার ইবনু সাইদ ইবনি আবি হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ, ৩৭. মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনি ফাররুখ রাহিমাহুল্লাহ, ৩৮. উমার ইবনু মাইমূন ইবনি মিহরান রাহিমাহুল্লাহ, ৩৯. আউফ আল-আরাবি রাহিমাহুল্লাহ, ৪০. মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাফসা রাহিমাহুল্লাহ ৪১. হিশাম ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ, ৪২. উহাইব ইবনুল ওরারদ রাহিমাহুল্লাহ ৪৩. ইউনুস ইবনু ইয়াজিদ আল-আইলি রাহিমাহুল্লাহ, ৪৪. আবু বকর ইবনু উসমান ইবনি সাহল ইবনি হুনাইফ রাহিমাহুল্লাহ, ৪৫. মামার ইবনু রাশিদ রাহিমাহুল্লাহ।[১]

তাহযিবুত তাহযিব ছাড়া অন্যান্য কিতাবে যে সকল বিখ্যাত উস্তাযের নাম এসেছে, তারা হলেন—

৪৬. ইবরাহিম ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ, ৪৭. যুহাইর ইবনু মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ ৪৮. আবু আওয়ানা আল-ওয়াদ্দাহ ইবনু খালিদ রাহিমাহুল্লাহ, ৪৯. রবি ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ, ৫০. খালিদ ইবনু মিহরান আল-হাযযা রাহিমাহুল্লাহ, ৫১. আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ ইবনি জাবির রাহিমাহুল্লাহ, ৫২. সুফইয়ান ইবনু

---

[১] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৩

উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ, ৫৩. হাম্মাদ ইবনু সালামা রাহিমাহুল্লাহ, ৫৪. মিসআর ইবনু কিদাম রাহিমাহুল্লাহ।[১]

এছাড়াও জেলখানায় বসে তিনি রাবি ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে প্রায় চল্লিশটি হাদিস শুনেছেন।[২]

ফিকহের বিশিষ্ট উস্তায

আমরা জানি, প্রতিটি সফল ব্যক্তির পেছনে কারও না কারও বিশেষ অবদান থাকে। এখন কথা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ফিকহি ব্যক্তিত্ব গঠনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি? চলুন, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা তার মুখ থেকেই শুনে আসি। তিনি প্রায়শই স্বগতোক্তির মতো করে বলতেন—

تعلمت الفقه الذى عندى من أبى حنيفة

আমি ফিকহের যে জ্ঞান লাভ করেছি, তার পুরোটাই ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে।[৩]

উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর পূর্ণ জীবনী অধ্যয়ন করলে, পাঠকমাত্রই এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে, তিনি ইমাম আবু হানিফার একান্ত প্রিয় ও স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া তিনি ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে যতটা উপকৃত হয়েছেন, অন্য কারও কাছ থেকে ততটা উপকার পাননি। এজন্যই অনেক গবেষক আলিম তাকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। ইবনু হাজার হাইতামি ইমাম আবু হানিফার মর্যাদা ও অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তার নিকট ইলম অর্জন করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ইমামগণ। যোগ্য ও দক্ষ আলিমগণ তার হাতেই গড়ে উঠেছেন। বিখ্যাত সাধক ও আলিমদের অগ্রপথিক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাদেরই একজন।'[৪]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫২; *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৩; *তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮৫

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২৪৫

[৩] *আল-খাইরাতুল হিসান*, পৃষ্ঠা : ৩৩

[৪] *আল-খাইরাতুল হিসান*, পৃষ্ঠা : ৬

অধিকন্তু বিশিষ্ট হানাফি আলিমগণের জীবনী নিয়ে রচিত *আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফি তবাকাতিল হানাফিয়াহ* গ্রন্থেও ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নাম বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। উক্ত গ্রন্থে এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে তিনি ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেখান থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

এক. একবার তাকে ইশার সালাতের শেষ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ইশার সালাতের সময় ফজর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। তবে অর্ধরাত্রির পর থেকে মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়।' ইমাম আবু হানিফাও একই মত পোষণ করেন।[১]

দুই. তিনি কখনো কোনো মাসআলা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ইমাম আবু হানিফার শরণাপন্ন হতেন। একবার এক লোকের দুই দিরহাম হারিয়ে গেল। তার কাছে ছিল মোট তিন দিরহাম। দুই দিরহাম নিজের। আর বাকি এক দিরহাম আরেক জনের। এখন সে বুঝতে পারছে না, হারিয়ে যাওয়া দিরহাম দুটি কার মালিকানায় ছিল? আর বাকি এক দিরহামের মালিকই বা কে হবে? এ বিষয়টি ইবনুল মুবারককে জানানো হলে তিনি সমাধানের জন্য সোজা ইমাম আবু হানিফার বাসায় গিয়ে হাজির হন। ইমাম আবু হানিফা তখন বললেন, হারানো দিরহামগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে এক দিরহামের মালিক ছিল। আর বাকি এক দিরহামটি তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। দুইভাগ পাবে দুই দিরহামের মালিক—যার কাছ থেকে দিরহাম দুটি হারিয়ে গেছে। আর এক ভাগ পাবে এক দিরহামের মালিক।'[২]

তিন. একবার একটি ফিকহি মজলিসে ইমাম আবু হানিফাকে প্রশ্ন করা হলো, 'গোশতের পাতিলে জীবন্ত পাখি পড়ে মারা গেলে, পাতিলের গোশত কী করব? ফেলে দেব? নাকি ধুয়ে খেতে পারব?' প্রশ্নটির উত্তর তিনি নিজে না দিয়ে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী?'

ছাত্ররা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে তরকারির ঝোল ফেলে দিতে হবে। তবে গোশত ধুয়ে খাওয়া যাবে।' তাদের উত্তর শুনে ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'এ নিয়ম কেবল

---

[১] *আল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮১

[২] *আল খাইরাতুল হিসান*, পৃষ্ঠা : ৪৪

তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন পাতিলের গোশত স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু পাতিলের গোশত যদি টগবগে গরম পানিতে ফুটতে থাকে এবং ওই অবস্থায় পাখিটা পড়ে মারা যায়, তখন আর সেই গোশত খাওয়া যাবে না। ফেলে দিতে হবে।'

ইবনুল মুবারক সেদিন ইমাম আবু হানিফার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার এই পার্থক্যমূলক ফাতওয়া শুনে তিনি কিছুটা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কাছাকাছি দুটি মাসআলায় ভিন্ন মতামত দেয়ার কারণ কী?'

উত্তরে ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'কারণ আর কিছুই না—ফুটন্ত পানিতে পড়ে পাখি মারা গেলে সেটার নাড়িভুঁড়ি ও পেটের ভেতরকার নাপাকি পাতিলের পানি ও গোশতের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তাই এমন পরিস্থিতিতে, পাতিলের গোশত আর খাওয়া যাবে না। অন্যদিকে, পাতিলের গোশত স্বাভাবিক থাকলে, পাখিটি মারা গেলেও তার ভেতরকার নাপাকি গোশতের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে না। তখন সেই হাদিসের আলোকে তোমাদের দেওয়া মতামতটি গ্রহণযোগ্য হবে।' শাইখের কাছ থেকে এমন চমৎকার ব্যাখ্যামূলক উত্তর শুনে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক যারপর নাই বিস্মিত হন।[১]

ইমাম আবু হানিফার দারসে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন ইবনুল মুবারক। সবসময় চেষ্টা করতেন তার আশেপাশে থাকতে। যার ফলে তিনি শাইখের কাছ থেকে এমন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানতে পেরেছেন, যেগুলো ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতো একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছাত্ররাও জানতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে আবু সুলাইমান বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, 'একদিন ইমাম আবু হানিফাকে আমি জিজ্ঞেস করি, কোনো ব্যক্তি নিজের শহর বাদ দিয়ে অন্য শহরে গিয়ে যাকাত আদায় করার বিধান কী?' উত্তরে আবু হানিফা বলেন, 'ওই শহরে তার আত্মীয় কিংবা তুলনামূলক বেশি অভাবী মানুষ থাকলে কোনো সমস্যা নেই।'

আবু সুলাইমান বলেন, 'আমি মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মাদকে শোনালে তিনি মন্তব্য করেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর মাসআলা। কিন্তু এই মাসআলা আমরা সরাসরি শাইখের কাছ থেকে শুনিনি। এ কথা বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাসআলাটি লিখে রাখেন।'[২]

---

[১] *আল খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা : ৪৭*

[২] *আল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮১*

ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কিতাবাদি ঘেঁটে দেখেছি, সেখানে প্রায় ৮০০টি হাদিস ইমাম আবু হানিফার ফাতওয়া অনুযায়ী সংকলন করা হয়েছে।'[১]

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে ইমাম আবু হানিফার যত প্রশংসা করতে দেখেছি, অন্য কাউকে তত প্রশংসা করতে দেখিনি। তিনি সবসময় ইমাম আবু হানিফার কথা বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন।'[২]

ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার দক্ষতা ও অবস্থান সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর কয়েকটি অবিস্মরণীয় মন্তব্য—

» আমি ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার সমকক্ষ আর কাউকে দেখিনি; এমনকি ফিকহ বিষয়ে অন্য কেউ তার মতো এত সুন্দর আলোচনা করতে পারতেন না।[৩]

» ইমাম আবু হানিফা ছিলেন আমার দেখা সবচেয়ে বড় ফকিহ। এ শাস্ত্রে তার মতো দক্ষ কাউকে দেখিনি আমি।[৪]

» আমার দেখামতে, ইমাম আবু হানিফার চেয়ে বিচক্ষণ আর কেউ ছিলেন না।[৫]

» ইমাম আবু হানিফা অনেক বেশি পরহেজগার ও আল্লাহভীরু ছিলেন। মহান আল্লাহ তাকে ধনসম্পদ ও জালিমের চাবুক দ্বারা পরীক্ষা করেছেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি পাশও করেছেন।[৬]

» তোমরা কি ইমাম আবু হানিফা ছাড়া এমন কারও সন্ধান দিতে পারবে, যার সামনে রাষ্ট্রের সম্মানিত পদ আর অঢেল সম্পদ উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরও

---

[১] *কিতাবুল ওয়ার, পৃষ্ঠা:* ৭৪

[২] *আল-খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা :* ৪১

[৩] *তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত, খণ্ড :* ২; *পৃষ্ঠা :* ২২০

[৪] *আল-খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা :* ২৯; *ইনহাউস সাকান, পৃষ্ঠা :* ৭৬

[৫] *আল-খাইরাতুল হিসান, পৃষ্ঠা :* ৪১

[৬] *তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত, খণ্ড :* ২; *পৃষ্ঠা :* ২২১

তিনি সেগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন? কিংবা সেসবের জন্য মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হয়েও দিনরাত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থেকেছেন?[১]

» তোমরা এভাবে বলো না যে, এটা ইমাম আবু হানিফার মত; বরং এভাবে বলো, এটা হাদিসের ব্যাখ্যা।[২] অর্থাৎ, তার প্রতিটি ফাতওয়া ও মতামত ছিল হাদিস থেকে উৎসারিত তথা হাদিসের নির্যাস।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি ইমাম আওযায়ির সাথে সাক্ষাতের জন্য শামে গিয়েছিলাম। সেখানে বৈরুত শহরে তার সাথে আমার দেখা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের মাঝে। কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, 'হে খোরাসানি, কুফায় নাকি আবু হানিফা নামে এক নতুন মতবাদ-প্রণেতার আবির্ভাব ঘটেছে?'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে সেদিনের আলোচনাপর্ব সেখানেই সমাপ্ত টানি। এরপর বাসায় ফিরে এসে আবু হানিফার কিতাব ঘাঁটতে শুরু করি। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি সুন্দর মাসআলার একটি অনুলিপি করে ফেলি। এ কাজে প্রায় তিন দিন লেগে যায় আমার।

তিন দিন পর আবার তার মসজিদে হাজির হলাম। তিনি ছিলেন সে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন। আমার হাতে অনুলিপিটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন কিতাব?' আমি মুখে কিছু না বলে কিতাবটি বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই পড়তে শুরু করেন। কিতাবটি শুরু হয়েছে এভাবে—'নুমান ইবনু সাবিত' বলেন...।

তখন সালাতের সময় হয়ে যাওয়ায় অল্প কিছু পড়েই পাশে রেখে দিলেন তিনি। সালাতের পর কিতাবটি আবার হাতে নিলেন। এরপর যথেষ্ট ভক্তি ও বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলেন, 'কে এই নুমান ইবনু সাবিত?' আমি বিনয়ের সাথে উত্তর দিলাম, 'তিনি ইরাকের একজন প্রসিদ্ধ শাইখ। সেখানেই তার সাথে আমার দেখা

[১] *আল-খাইরাতুল হিসান*, পৃষ্ঠা : ৩৯

[২] *আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৪৬০

হয়।' তিনি বলতে লাগলেন, 'ইনি তো মনে হচ্ছে যুগশ্রেষ্ঠ এক আলিম। তুমি তার কাছ থেকেই বেশি বেশি জ্ঞান আহরণ করো!' তখন আমি বললাম, 'জনাব, এই যুগশ্রেষ্ঠ আলিমই আমাদের সেই আবু হানিফা—কিছুদিন আগে যার ব্যাপারে আপনি আপত্তি জানিয়েছিলেন!'

একই ধরনের ঘটনা জানা যায় আবু হাতিম জুরজানির সূত্রে। সেখানে শেষের দিকে এ কথাগুলোও বলে দেওয়া হয়েছে, ...এরপর মক্কায় আবু হানিফার সাথে ইমাম আওযায়ির সাক্ষাৎ ঘটে। অনুলিপিতে রয়েছে এমন কয়েকটা মাসআলা নিয়ে বাহাস হয় তাদের মাঝে। ইমাম আবু হানিফা সেদিন আরও অধিক শক্তিশালী যুক্তি-সহকারে মাসআলাগুলো উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে ইবনুল মুবারকের সাথে সাক্ষাৎ হলে ইমাম আওযায়ি বলেন, 'লোকটার ইলমের গভীরতা আর বোধশক্তির পরিপক্বতা দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছি! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। এতদিন আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি তাকে আঁকড়ে ধরো; তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করো! কেননা, তার ব্যাপারে আমরা যেসব নেতিবাচক কথা শুনেছি তা ছিল ডাহা মিথ্যে।'[১]

[১] *শারহু কিতাবিল আসার,* ভূমিকা, শাইখ আফগানি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫০

খ্যাতিমান শিষ্যগণ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র-সংখ্যা এত বেশি যে, গুণে শেষ করা যাবে না। কারণ, অগণিত মুহাদ্দিস তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করে গিয়েছেন। এই বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ডের অসংখ্য মুহাদ্দিস তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কেননা, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তিনি শিক্ষা ও বাণিজ্যিক সফর করেছেন জীবনের ঊষালগ্ন থেকেই। তার সংবাদ পেয়ে দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসুরা ছুটে এসেছেন এবং তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন।'[১]

হাফিয ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার সূত্রে বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী হাদিস বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন কিতাবে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। তার যে সকল উস্তায ও সমসাময়িক আলিম তার কাছ থেকে হাদিস শুনে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

১. সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ, ২. মামার ইবনু রাশিদ রাহিমাহুল্লা(৩. আবু ইসহাক আল-ফাযারি রাহিমাহুল্লাহ, ৪. জাফর ইবনু সুলাইমান আদ-দবয়ি রাহিমাহুল্লাহ, ৫. বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহ, ৬। দাউদ ইবনু আব্দির রহমান আল-আত্তার রাহিমাহুল্লাহ, ৭. সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ, ৮. আবুল আহওয়াস রাহিমাহুল্লাহ, ৯. ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ, ১০. মামার

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৩

ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ, ১১. ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ, ১২. আবু বকর ইবনু আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ।

কৃতি ছাত্রবৃন্দ

১. ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহিমাহুল্লাহ, ২. মুসলিম ইবনু ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ, ৩. আবু উসামা আল-কুফি রাহিমাহুল্লাহ, ৪. আবু সালামা আত-তাবুযাকি রাহিমাহুল্লাহ ৫. নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ, ৬. আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রাহিমাহুল্লাহ, ৭. ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ, ৮. ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহিমাহুল্লাহ, ৯. ইবরাহিম ইবনু ইসহাক আত-তালিকানি রাহিমাহুল্লাহ, ১০. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ মারদাওয়াই রাহিমাহুল্লাহ, ১১. ইসমাইল ইবনু আবান আল-ওয়াররাক রাহিমাহুল্লাহ, ১২. বিশর ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাখতিয়ানি রাহিমাহুল্লাহ, ১৩. হিব্বান ইবনু মুসা রাহিমাহুল্লাহ, ১৪. হাকাম ইবনু মুসা রাহিমাহুল্লাহ, ১৫. যাকারিয়া ইবনু আদি রাহিমাহুল্লাহ, ১৬. সাইদ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ, ১৭. সাইদ ইবনু আমর আল-আশআসি রাহিমাহুল্লাহ, ১৮. সুফইয়ান ইবনু আব্দিল মালিক আল-মাররুযি রাহিমাহুল্লাহ, ১৯. সালামাহ ইবনু সুলাইমান আল-মাররুযি রাহিমাহুল্লাহ, ২০. সুলাইমান ইবনু সালিহ সালমূয়াহ রাহিমাহুল্লাহ, ২১. আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান আবদান রাহিমাহুল্লাহ, ২২. আবু বকর ইবনু আবি শাইবা রাহিমাহুল্লাহ, ২৩. উসমান ইবনু আবি শাইবা রাহিমাহুল্লাহ, ২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনি আবান আল-জুফি রাহিমাহুল্লাহ, ২৫. আলি ইবনুল হাসান ইবনি শাকিক রাহিমাহুল্লাহ, ২৬. আমর ইবনু আউন রাহিমাহুল্লাহ, ২৭. আলি ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ, ২৮. মুহাম্মাদ ইবনুস সালত আল-আসাদি রাহিমাহুল্লাহ, ২৯. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনি সাহম আল-আনত্বাকি রাহিমাহুল্লাহ, ৩০. আবু কুরাইব রাহিমাহুল্লাহ, ৩১. আবু বকর ইবনু আসরাম রাহিমাহুল্লাহ, ৩২. মানসুর ইবনু আবি মুযাহিম রাহিমাহুল্লাহ, ৩৩. মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল আল-মাররুযি রাহিমাহুল্লাহ, ৩৪. ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব আল-মাকাবিরি রাহিমাহুল্লাহ ৩৫. সুওয়াইদ ইবনু নাসর রাহিমাহুল্লাহ, ৩৬. হাসান ইবনু দাউদ আল-বলখি রাহিমাহুল্লাহ।

এছাড়া আরও যে সকল বিখ্যাত মুহাদ্দিস সরাসরি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন—

৩৭. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ, ৩৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি রাহিমাহুল্লাহ, ৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ, ৪০. ইয়াহইয়া ইবনু আদম রাহিমাহুল্লাহ, ৪১. আব্দুর রাযযাক ইবনু হুমাম রাহিমাহুল্লাহ, ৪২. মাককি ইবনু ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ, ৪৩. মুসা ইবনু ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ, ৪৪. ইয়ামার ইবনু বিশর রাহিমাহুল্লাহ, ৪৫. আবুন-নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম রাহিমাহুল্লাহ, ৪৬. হাসান ইবনুর রাবি আল-বুরানি রাহিমাহুল্লাহ, ৪৭. হাসান ইবনু আরাফাহ রাহিমাহুল্লাহ, ৪৮. ইয়াকুব আদ-দাওরাকি রাহিমাহুল্লাহ, ৪৯. ইবরাহিম ইবনু মাজশার রাহিমাহুল্লাহ, ৫০. আহমাদ ইবনি মুনি রাহিমাহুল্লাহ, ৫১. হাসান ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ, ৫২. হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মাররুযি রাহিমাহুল্লাহ, ৫৩. আবু দাউদ আত-তয়ালিসি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একজন বিজ্ঞ আলিম। হাফিযে হাদিস ও ইলমের নিষ্ঠাবান প্রচারক। আক্ষরিক অর্থেই তিনি জ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন।[১]

[১] *তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮৬*

শিক্ষা ও গবেষণায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ

গবেষণারীতি

ইলম অন্বেষণ ও গবেষণাক্ষেত্রে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর স্বাতন্ত্র্য ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ দুটি মৌলিক শাখায় তিনি পদ্ধতিগত ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন এবং সেক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছেন। নিম্নে আমরা তার এই অনন্য গবেষণারীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরছি—

■ হাদিস গ্রহণে সতর্কতামূলক কঠোরতা :

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ নীতিগতভাবে হাদিস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। বিতর্কিত ও অভিযুক্ত রাবিদের থেকে কখনো হাদিস বর্ণনা করতেন না। যাদের স্মরণশক্তির ব্যাপারে বিশিষ্টজনদের আপত্তি রয়েছে, তাদের মুখস্থ বর্ণনাকৃত হাদিসও গ্রহণ করতেন না তিনি। এমনকি তাদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্কও করে দিতেন। নিজেও সবসময় অভিযোগের বিষয়গুলো সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। অজস্র হাদিস আত্মস্থ থাকা সত্ত্বেও কিতাব না দেখে মুখস্থ বলা থেকে বিরত থাকতেন সবসময়।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রায় চার হাজার মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদিস শোনার পরও তাদের মধ্য থেকে মাত্র এক হাজার মুহাদ্দিসের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সতর্কতাবশত বাকিদের হাদিসগুলো বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কার কাছ থেকে ইলম শিখব?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করেছেন, তাদের কাছ থেকে।'

তার এই বিশেষ সতর্কতা ও কঠোরনীতির কারণে প্রায়শই তাকে বিপাকে পড়তে হতো, বেশ কষ্ট পোহাতে হতো। দেখা যেত, হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এমন একজন মুহাদ্দিসের সাক্ষাতে গিয়েছেন, যিনি নিজে নির্ভরযোগ্য; কিন্তু যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি নির্ভরযোগ্য নন। কিংবা তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য নন; তবে যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এই উভয় শ্রেণির রাবিদের হাদিস এড়িয়ে চলতেন সবসময়। অন্যদের কাছে সেসব হাদিস বলা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কেবল তাদের সূত্রেই হাদিস বর্ণনা করতেন, যারা নিজেরা বিশ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন।[১] তিনি বলতেন, 'সনদ দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হওয়াতে কোনো বিশেষত্ব নেই। বরং বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততাই আসল কথা।'[২]

হাদিস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তার এই কঠোর নীতির বিষয়ে একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কেউ যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হাদিস শেখে, তবে সনদের ব্যাপারে এত কঠোর হবার কী দরকার?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহকে খুশি করার জন্যই তো সনদের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। সনদ বিশুদ্ধ হলে শরিয়ার বিধি-বিধানগুলো মেনে চলা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে।'[৩]

■ **সনদের প্রতি গুরুত্বারোপ :**

মুসলিম উম্মাহর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সনদ বা উৎস-পরম্পরা। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নেই, যার প্রতিটি বাণী ও বিধান সনদ ও প্রজন্ম-পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে তার অনুসারীদের আলোর পথ দেখাচ্ছে। আলোর

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[২] *আদাবুল ইমলা-ই ওয়াল ইসতিমলা,* পৃষ্ঠা : ৫৭

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া,* খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৬

এই ধারা যেন সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ও নিরাপদ থাকে, সেদিকে লক্ষ রেখেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সনদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতেন। সনদবিহীন হাদিস গ্রহণ থেকে সবসময় বিরত থাকতেন। এমনকি সনদ না থাকলে বর্ণনাকারীর ইলমের প্রাচুর্য ও গভীরতার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি বলতেন, 'যারা সনদ না জেনে হাদিস শোনে, তাদের অবস্থা ঠিক ওই ব্যক্তির মতো, যে মই ছাড়া ছাদে ওঠার চেষ্টা করে।'

ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'যে ব্যক্তি সনদবিহীন হাদিস গ্রহণ করে, সে যেন রাতের অন্ধকারে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে; অথচ সে জানতেও পারে না, সেই কাঠগুলোর ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে এক বিষধর সাপ!'[১] সনদের ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ির বিখ্যাত উক্তি—

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশবিশেষ। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা তা-ই বলে বেড়াত![২]

■ **বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততায় সৌকর্য বিচার :**

কোনো মুহাদ্দিস খুব ধার্মিক বা ইবাদতগুজার হলেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না; বরং ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখতেন, তিনি কী ধরনের হাদিস বর্ণনা করেন। হাদিস গ্রহণে তার নীতি এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে, বড় মাপের মুহাদ্দিস ব্যতীত অন্যদের পক্ষে তা খুব সহজে বোধগম্য হতো না। এজন্যই ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম-সহ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ তার বিশ্বস্ততা আখ্যাদান-নীতি গ্রহণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তার অভিমতকে মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বেশ কিছু উদাহরণ টেনেছি। এখানে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

বাসরার একজন ধার্মিক ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি হিসেবে আব্বাদ ইবনু কাসির আস-সাকাফি ছিলেন বেশ সুপরিচিত। কিন্তু তার সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণনা করা হলে, ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'ধার্মিক ও নেককার ব্যক্তি হিসেবে

---

[১] *ফাইযুল কাদির,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৩৩

[২] *সহিহ মুসলিম,* ভূমিকা, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১২

তার জুড়ি নেই। তবে হাদিসের ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্য নেই।[১] কারণ, তিনি মুনকার হাদিস[২] বর্ণনা করতেন। এজন্য নিছক দ্বীনদারি তার হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারেনি।'

■ হাদিস বর্ণনায় শব্দচয়নে সতর্কতা :

হাদিস বর্ণনার সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সবসময় খুব সতর্ক থাকতেন। নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'কাউকে হাদিস বলার সময় আমি কখনো ইবনুল মুবারককে 'হাদদাসানা'[৩] বলতে শুনিনি। তিনি 'হাদদাসানা'র পরিবর্তে 'আখবারানা'[৪] ব্যবহার করা অধিকতর ব্যাপক ও যথার্থ মনে করতেন।'[৫]

উপরিউক্ত শব্দদুটির ব্যাবহারিক পার্থক্য এই যে, বর্ণনাকারী যদি হাদিসটি সরাসরি তার শাইখের মুখ থেকে শুনে থাকেন, তাহলে সাধারণত 'হাদদাসানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ণনাকারী যদি হাদিসটি শাইখের সামনে অনুপাঠকারীর মুখ থেকে শুনে থাকেন এবং শাইখ তাতে সম্মতি জানান, তখন 'আখবারানা' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। ইমাম মুসলিম শব্দদুটির মাঝে এভাবেই পার্থক্যের সীমারেখা টেনেছেন। অবশ্য ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিতে শব্দদুটির মাঝে আদৌ কোনো পার্থক্য নেই।

■ হাদিস ও ফাতওয়ার মাঝে সমন্বয় :

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবি ও তাবিয়িগণ যেসব ফাতওয়া দিয়েছেন কিংবা তারা যে অনুপাতে আমল করেছেন, হাদিসের পরিভাষায় সেগুলোকে 'আসার' বলে। ইবনুল মুবারক হাদিসের পাশাপাশি এসব আসারের প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সেই সাথে তার আশপাশের মানুষগুলোকেও উৎসাহিত করতেন এসব আসার গ্রহণ করতে।

---

[১] *মিযানুল ইতিদাল*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১২-১৪

[২] বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীতে দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদিসকে মুনকার হাদিস বলে।

[৩] حدثنا

[৪] أخبرنا

[৫] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যদি কখনো তুমি বাধ্য হয়ে বিচারকের পদ গ্রহণ করো, তখন এসব আসারের সাহায্য নেবে। (কারণ, এতে বিষয়-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সমস্যার সমাধান ও শেকড়ের সন্ধান পাবে।)[১]
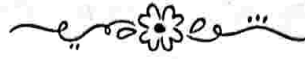
[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৬

আকিদা-বিশ্বাস

দ্বীনের মৌলিক আকিদা তথা বিশ্বাসে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অবিসংবাদিত প্রতিনিধি ছিলেন। তার জ্ঞান-গবেষণায় ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দ্বীনের পূর্ণ রূপরেখা বিমূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে। এখানে আকিদা-সংক্রান্ত তার বেশ কয়েকটি মত ও পর্যবেক্ষণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে—

■ **সাহাবিদের মর্যাদা সম্পর্কে :**

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগী ও সাথিবর্গের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন দ্বীনের অংশ। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যার মাঝে দুটি গুণ থাকবে, সে আখিরাতে মুক্তিলাভ করবে—এক. সত্যবাদিতা। দুই. সাহাবিদের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা।[১]

একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমার ইবনু আব্দিল আজিজের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'জিহাদের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগী হয়ে মুআবিয়ার নাকে যে ধূলিকণা লেগেছে, তা উমার ইবনু আব্দিল আজিজের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম! মুআবিয়া তো সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি নবিজির পেছনে সালাত আদায়

---

[১] *আশ-শিফা*, কাজি ইয়ায, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪২

করেছেন। সালাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান থেকে যখন উচ্চারিত হতো—সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ[১]—মুআবিয়া তখন বলে উঠতেন, 'রাব্বানা লাকাল হামদ'।[২] এখন তুমিই বলো, এত কিছুর পর মুআবিয়ার মর্যাদা প্রমাণের জন্য আর কিছুর দরকার আছে কি?'[৩]

একজন সাহাবির মর্যাদা কতটা উঁচুতে তা ওপরের কথাটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেন—

“

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

তোমরা আমার সাহাবিদের গালমন্দ করো না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবু সেটা তাদের এক মুদ বা আধামুদ দানের সমান হবে না।[৪][৫]

■ বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম :

ইমাম ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বিদআত ও বিদআতিদের উত্থানকে উম্মাহর জন্য বড় ধরনের বিপদ মনে করতেন। তার মতে দ্বীনের মাঝে অনুপ্রবেশকারী নবাগত বিষয়গুলো ইসলামের খুঁটি নড়বড়ে করে দেয়। ঈমানের আত্মিক শক্তির বিনাশ ঘটায়। তিনি বলতেন—

'ভাই আমার, একজন মুসলিম যদি প্রকৃত অর্থেই সুন্নাহর অনুসারী হয়, তবে মৃত্যু তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহবিশেষ। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য। তাঁর কাছেই ফিরে যাব একদিন। অতএব, আমরা আমাদের একাকিত্ব, দ্বীনি ভাইদের

---

[১] অর্থ : আল্লাহ ওই ব্যক্তির দুআ কবুল করেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।

[২] অর্থ : হে আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

[৩] *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, খণ্ড ২; পৃষ্ঠা : ২৩৮

[৪] হাদিসে এখানে 'মুদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ বলতে দুই হাত মুনাজাতের মতো একত্র করে তাতে যতটুকু ফসল নেওয়া যায়, ততটুকু বোঝায়।

[৫] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৭৩

বিদায়, নিঃসঙ্গ সময়যাপন এবং বিদআতের কারণে সৃষ্ট যাবতীয় অভিযোগ আল্লাহর কাছেই পেশ করছি।[১]

ইবনুল মুবারক আজীবন বিদআতিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। লোকদেরও সতর্ক করে গেছেন এ ব্যাপারে। একবার তিনি শুনতে পেলেন, হারিস আল-মাহাসিবি এক বিদআতি ব্যক্তির কাছ থেকে খাবার খেয়েছেন। এ কথা শোনামাত্র তার মাঝে দ্বীনি মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। তিনি হারিসকে বললেন, 'আমি তোমার সাথে আগামী ৩০ দিন কথা বলব না।'[২]

উল্লেখ্য, দ্বীনের খাতিরে এমনটা করার অবকাশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবি কাব ইবনু মালিক তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

■ মুতাজিলা ও জাহমিয়া :

মুতাজিলা ও জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে ইবনুল মুবারকের অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। মুতাজিলাদের অন্যতম শীর্ষনেতা আমর ইবনু উবাইদ একসময় হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিল। পরে মুতাজিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনু আতার পাল্লায় পড়ে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তার কথায় আরও অনেকেই দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ে। ব্যক্তিজীবনে আমর ছিল বেশ সম্মানি ও ধার্মিক একজন মানুষ। এ কারণে সরলমনা মানুষগুলো তার দলে অংশ নিতে শুরু করে। সে কাদরিয়া[৩] মত প্রচার করে বেড়াত। খুব দ্রুত বহু লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এসব।

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'আমি একবার ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করি, মুহাদ্দিসগণ উবাইদকে বয়কট করেছে কেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'সে লোকদের কাদরিয়া মতবাদের দিকে আহ্বান করত।'[৪]

---

[১] *আল-ইতিসাম লিশ শাতিবী,* খণ্ড ১; পৃষ্ঠা : ৮৬

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া,* খণ্ড ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৩] কাদরিয়া ফিরকার লোকেরা তাকদির অস্বীকার করে। তাদের মতে পূর্বনির্ধারিত তাকদির বলতে কিছু নেই; মানুষ যা করে তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, নিজ নিজ প্রভাবে করে।

[৪] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল,* পৃষ্ঠা : ৩৮৩

এখান থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো বিদআতি অন্যকে নিজের ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তবে তার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। ইবনুল মুবারকের উস্তায সুফইয়ান আস-সাওরি বলেন, 'জাহমিয়া[১] ও কাদরিয়া ফিরকার লোকেরা কাফির।'[২]

■ কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট :

ইসলামের সোনালি যুগে বিশিষ্ট আলিমগণ 'খালকে কুরআন'[৩]-এর ফিতনা নির্মূল করতে গিয়ে নানা ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তাদের মাঝে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ।

ইবনুল মুবারক-সহ সকল আলিমের মতে, কুরআন আল্লাহর বাণী, তাঁর বিশেষ একটি গুণ ও সিফাত; মাখলুক বা সৃষ্টি নয়। আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি ইউনুস রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'একদিন আমি দেখি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কুরআন তিলাওয়াত করছেন। তিলাওয়াত শেষ করার পর স্বগতোক্তির মতো করে বলছেন, যে ব্যক্তি মনে করে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলুক, সে মূলত আল্লাহর সাথে কুফরি করে।'[৪]

■ সালাফদের নিন্দাকারী :

ইবনুল মুবারকের মতে, 'যে ব্যক্তি সালাফ তথা পূর্বসূরিদের গালি দেয়, তাদের নিন্দা করে, তার বর্ণিত হাদিস পরিহার করা ওয়াজিব।'

আলি ইবনু শাকিক বর্ণনা করেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে সবার সামনে বলতে শুনেছি, তোমরা আমর ইবনু সাবিতের হাদিস বর্জন করো। কারণ, সে

---

[১] এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইবনু সাফওয়ান। সে আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি অস্বীকার করে। তার মতে, আল্লাহর গুণসমূহ চিরন্তন নয়। সেসব নিতান্তই লয়শীল ও অস্থায়ী। সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি যেমন নশ্বর, অস্থায়ী, তেমনই কুরআন এক নশ্বর সৃষ্টি। জান্নাত-জাহান্নামও একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ তা এক নশ্বর সৃষ্টি, চিরন্তন নয়। জাহমের এই ভ্রান্ত মতবাদ অনেকেই বিশ্বাস করত এবং প্রচার করে বেড়াত। যারা তার এই ভ্রান্ত মতবাদ বিশ্বাস করে তাদের জাহম ইবনু সাফওয়ানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয় 'জাহমিয়া'।

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ২৮

[৩] কুরআন সৃষ্ট নাকি অসৃষ্ট?

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৭

সালাফদের কট্টর সমালোচক।'[১]

উবায়দুল্লাহ ইবনু মুসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমরা আবু হামযা আস-সুমালির কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় সেখানে ইবনুল মুবারক এসে হাজির হন। আবু হামযা আস-সুলামি তখন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কে একটি হাদিস শোনাচ্ছেন। সেই সাথে তার ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু মন্তব্যও জুড়ে দিচ্ছেন। ইবনুল মুবারক এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন; সঙ্গো সঙ্গো দাঁড়িয়ে যান। তার কাছ থেকে এ পর্যন্ত যত হাদিস লিখে রেখেছেন তিনি, সব ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সেখান থেকে চলে যান।'[২]

[১] *সহিহ মুসলিম*, ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ১২

[২] *মিযানুল ইতিদাল*, খণ্ড ১; পৃষ্ঠা : ৩৬৩

হাদিসশাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক

ইলমের সকল শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও হাদিসশাস্ত্রে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে এক প্রবাদপুরুষ। জীবনীলেখকেরা হাদিসশাস্ত্রে তার বিজ্ঞতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তার সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণের অভিমত সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন; তিনি যে সকল হাদিসবেত্তার সান্নিধ্য পেয়েছেন কিংবা যারা তার কাছ থেকে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন—তাদের বৃত্তান্তও তুলে ধরেছেন।

আমরা এখানে সেই দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে হাদিস বর্ণনায় তার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করব। তার অভূতপূর্ব স্মরণশক্তি ও হিফযের দ্রুততা এবং হাদিসশাস্ত্রে তার দক্ষতার বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরব। তার ছাত্র-শিক্ষকদের একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা পেশ করব এবং সবশেষে তার সূত্রে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করার মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

তার গ্রহণযোগ্যতায় সকল ইমামের ঐকমত্য

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি দিক এই যে, তার সম্বন্ধে 'জারহ ও তাদিলের কোনো ইমাম কোনোরূপ অভিযোগ বা বিরূপ মন্তব্য করেননি। সবাই তার সূত্রে বর্ণিত হাদিসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তার পূর্বে অন্য কোনো মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটতে দেখা যায়নি।

ইমাম ইজলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'খোরাসানের আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন হাদিসশাস্ত্রের একজন সমাদৃত ও নির্ভরযোগ্য ইমাম। ইলমের সকল শাখায় তার সমান দক্ষতা ছিল।'[১]

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবি। তিনি সবসময় সহিহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনা করতেন।'[২]

হাদিসশাস্ত্রে তার বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য কেবল এই তথ্যটিই যথেষ্ট যে, তার সূত্রে বিপুলসংখ্যক মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কুতুবু সিত্তার সংকলকগণ।[৩]

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ *সহিহ বুখারিতে* যাদের হাদিস এনেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাদের অন্যতম। তার সম্বন্ধে আব্দুর রহমান ইবনু ইউসুফ ইবনি খিরাশ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মারবুযি রাহিমাহুল্লাহ একজন বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারী।'[৪]

সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে বলা হয়েছে, তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস সর্বসম্মতভাবে হুজ্জত তথা অকাট্য দলিল।'[৫]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়িনের সামনে তার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলতেন, 'ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হলেন মুসলিমদের আদর্শ পুরুষ।'

একদিন ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহিমাহুল্লাহ আসনে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু যাকারিয়া, মা'মারের সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে কে বেশি গ্রহণযোগ্য—আব্দুর রাযযাক নাকি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক?'

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৫

[২] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[৩] *আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ১০৩

[৪] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২৪৬

প্রশ্ন শুনে তিনি হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিঃসন্দেহে আব্দুর রাযযাক এবং সমকালীন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' এরপর তিনি বলেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে আব্দুর রাযযাককে তুলনা করছ!'[১]

আবু ওয়াহাব মুহাম্মাদ ইবনু মুযাহিম বলেন, 'আমি ওই ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই, যে ইবনুল মুবারকের সূত্রে তার কোনো শাইখ থেকে হাদিস শোনার পর তা যাচাইয়ের জন্য ওই শাইখের নিকট উপস্থিত হয়।'[২] অর্থাৎ, হাদিস বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তার বর্ণিত হাদিসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মুহাদ্দিস ও হাদিস বিশারদগণের কাছে এতটাই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, কেউ তার সমালোচনা করলে কিংবা তার সম্পর্কে কটাক্ষমূলক কথা বললে তার ব্যাপারে এই আশঙ্কা করা হতো যে, সে হয়তো প্রকৃত দ্বীনদার নয়। আসওয়াদ ইবনু সালিম বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, আদর্শ পুরুষ। সুন্নাহর ক্ষেত্রে সর্বাধিক আস্থাভাজন। কাজেই কেউ তার ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য করলে বুঝতে হবে, তার দ্বীনদারির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।'[৩]

একবার আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রাহিমাহুল্লাহ তার একটি বাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্যে বাগদাদ আগমন করেন। সংবাদ পেয়ে বাগদাদের মুহাদ্দিসগণ তার নিকট ছুটে আসেন এবং বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'আপনি তো সুফইয়ান আস-সাওরি এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক দুজনের হাদিসের দরসেই বসেছেন; তাদের থেকে হাদিস শুনেছেন। এবার বলুন, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কার হাদিস অধিক গ্রহণযোগ্য?' উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমরা কী যে বলো! সুফইয়ান আস-সাওরি আজীবন চেষ্টা করলেও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সমকক্ষ হতে পারবেন না।'[৪]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬১

তিনি আরও বলেন, 'আমি সুফইয়ান আস-সাওরির মতো মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী কাউকে দেখিনি। তারপরও আমি তাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ওপরে স্থান দিতে পারব না।'[১]

আবু ইসহাক আল-ফাযারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হলেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আদর্শ পুরুষ।'

মুসায়্যিব ইবনু ওয়াযিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আবু ইসহাক আল-ফাযারিকে দেখেছি, তিনি ইবনুল মুবারকের সামনে নতজানু হয়ে বসে তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করছেন। অথচ তিনি বয়সে ইবনুল মুবারকের চেয়ে ২০ বছরের বড়।'[২]

আবু উসামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুহাদ্দিসগণের মাঝে ইবনুল মুবারকের অবস্থান যেন সাধারণ মানুষের মাঝে আমিরুল মুমিনিন!'[৩]

একবার ইমাম ফুযাইল ইবনু ইয়ায, সুফইয়ান আস-সাওরি এবং আরও কয়েকজন শাইখ মাসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় দূর থেকে ইবনুল মুবারককে আসতে দেখা যায়। তখন সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলে ওঠেন, 'এই মহান ব্যক্তি প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় আলিম।' প্রতিউত্তরে ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, 'তিনি শুধু প্রাচ্যের নন; বরং প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং এ দুটোর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আলিম।'

আব্দুর রহমান ইবনু আবি জামিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমরা মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর দরসে উপস্থিত হয়ে আর্জি করি, হে প্রাচ্যের ইমাম! আপনি আমাদের হাদিসের পাঠ দিন। আমাদের এই অনুরোধ শুনে সুফইয়ান আস-সাওরি বলে ওঠেন, ধিক তোমাদের! তিনি তো শুধু প্রাচ্যের নন; বরং প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং এ দুয়ের মাঝে সমস্ত অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ইমাম।'[৪]

---

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া,* খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬৩

[২] *তারিখু বাগদাদ,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৩; *তাহযিবুত তাহযিব,* খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬

[৩] *তারিখু বাগদাদ,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৬

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬২

উল্লেখ্য, ফুযাইল ইবনু ইয়ায ও সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুমাল্লাহ ছিলেন তৎকালীন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মান্যবর। কাজেই তারা যখন মসজিদুল হারামে বসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বড় আলিম ও খ্যাতিমান ইমাম বলে ঘোষণা করেন, তখন আর কারও মাঝে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা সন্দেহ পোষণের অবকাশ থাকে না।

একবার জনৈক ব্যক্তি সুফইয়ান আস-সাওরির কাছে একটি মাসআলা জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করেন—

'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'পূর্বাঞ্চল থেকে।'

'তোমাদের পূর্বাঞ্চলে কি যুগশ্রেষ্ঠ আলিম নেই?'

'থাকতে পারে। কে তিনি?'

'তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক।'

'তিনি কি পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আলিম?'

'হ্যাঁ তিনি পূর্ব-পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ আলিম!'[১]

উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সমসাময়িক খ্যাতিমান মানুষগুলো সাধারণত একে অন্যের প্রশংসা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুদার ও অবিবেচক হয়ে থাকেন। এতৎসত্ত্বেও ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ক্ষেত্রে তার সমকালীন আলিমদের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি প্রমাণ করে, বাস্তবিক অর্থেই তিনি স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আলি ইবনুল মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, হাদিসের সনদ প্রথমে ছয়জন মনীষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে।[২] এই ছয়জনের ইলমের মাধ্যমে বারোজন মহান মুহাদ্দিস আলোকিত হয়েছেন। এরপর এই বারোজনের সমস্ত ইলম পুনরায় ছয়জন মনীষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬২

[২] অর্থাৎ, প্রতিটি হাদিসের সনদ কোনো না কোনোভাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত।

এই ছয়জন হলেন—এক. ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ। দুই. আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রাহিমাহুল্লাহ। তিন. ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ। চার. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ। পাঁচ. ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনি আবি যায়িদা রাহিমাহুল্লাহ।[১] ছয়. ইয়াহইয়া ইবনু আদম রাহিমাহুল্লাহ।[২][৩]

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য রাবি।[৪] তিনি যে সকল কিতাব থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, সেগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। আর এই কিতাবগুলো তিনি উস্তাযদের মুখে শুনে শুনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।'[৫]

জাফর ইবনু আবি উসমান আত-তয়ালিসি বলেন, একদিন আমি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়িনকে জিজ্ঞেস করি—

'ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ও ওয়াকি ইবনুল জাররাহ কোনো হাদিস নিয়ে মতবিরোধ করলে কার মতামত প্রাধান্য পাবে?'

'ইয়াহইয়া আল-কাত্তানের।'

'ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ও আব্দুর রহমানের মাঝে যদি কোনো হাদিস নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তখন কার মত প্রাধান্য পাবে?'

'প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তখন শক্তিশালী কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'তিনি কি আবু নুআইম বা আব্দুর রহমান?'

'না, যদি তাদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়, তারপরও তৃতীয় একজনকে খুঁজে নিতে হবে।'

'তবে কি তিনি আশজায়ি?'

---

[১] ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৪

[৩] আলি ইবনুল মাদিনির এই মূল্যায়নের যথার্থতা বোঝার জন্য ইমাম বুখারির এই ভাষ্যটিই যথেষ্ট যে, তিনি বলেন, আলি ইবনুল মাদিনি ব্যতীত অন্য কোনো আলিমের সামনে বসলে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয় না।

[৪] তিনি সবসময় সহিহ ও বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করতেন।

[৫] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৪

'না, আশজায়ির মৃত্যুর সাথে সাথে তার বর্ণিত হাদিসগুলোও কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে।'

'তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক?'

'(উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) হুম, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। কারণ, তিনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস তথা হাদিসশাস্ত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।'[১]

একবার ইবরাহিম আল-হারাবিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'মা'মার রাহিমাহুল্লাহর শিষ্যদের মাঝে কোনো হাদিস নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে কার মত অধিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর মত।'[২]

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন এবং ইবরাহিম আল-হারাবি ছাড়াও আরও অনেকেই হাদিসশাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন এবং তাকে 'আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

অভূতপূর্ব স্মরণশক্তি

ইলমের সকল শাখায়, বিশেষ করে, ইলমুল হাদিসের ক্ষেত্রে স্মরণশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীর তাকওয়ার পাশাপাশি হিফয ও স্মরণশক্তিও পরখ করে নিতেন। কারও আল্লাহভীরুতা অতি উঁচু পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও হিফযের ঘাটতি দেখা দিলে তার হাদিস বর্জন করা হতো। তাকে গণ্য করা হতো দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে। তাছাড়া সেই সময়ে হাদিস সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যমই ছিল হিফয বা মানুষের স্মৃতিশক্তি। কাজেই মুখস্থ করতে পারার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

মহান আল্লাহ ইবনুল মুবারককে বিস্ময়কর হিফয ও স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। তিনি কেবল একবার দেখে কিংবা শুনেই বিশাল বড় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। আর একবার যেটা মুখস্থ করতেন, সেটা কখনো ভুলে যেতেন না। তার এই আশ্চর্যজনক মেধা ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'স্মৃতি

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৪

কখনো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অর্থাৎ, কখনো এমন হয়নি, একটি জিনিস মুখস্থ করার পর সেটা পরে ভুলে গিয়েছি।'[১]

নাঈম ইবনু হাম্মাদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'একবার আমার বাবা কোনো এক কারণে রেগে গিয়ে বলেন, তোমার বইগুলো হাতে পেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবো! আমি তখন উত্তর দিলাম, কোনো সমস্যা নেই, বাবা। সবগুলো বই-ই আমার একদম মুখস্থ!'[২]

তার হাদিস সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে নযর ইবনু মুসাওয়ির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করি, হে আবু আব্দির রহমান, আপনি কি মুখস্থ করে হাদিস সংরক্ষণ করেন? তিনি কিছুটা ক্রোধ ও বিরক্তির সাথে উত্তর দেন, আমি কখনোই হাদিস মুখস্থ করি না; বরং প্রয়োজন হলে হাদিসের কিতাব হাতে নিয়ে একনজর চোখ বুলাই। এতেই প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমার স্মৃতিতে গেঁথে যায়।'[৩]

এমনই বিস্ময়কর ছিল তার মেধা ও স্মরণশক্তি। যার মস্তিষ্কে এত ধার তার মুখস্থের পরিমাণও যে অবাক করার মতো, সেটা তো বলাই বাহুল্য। চলুন, এবার তাহলে সে-সম্পর্কেই কিছু ধারণা নেওয়া যাক। একবার তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাম্মাদ ইবনু যায়িদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে হাম্মাদের শিষ্যরা তাকে বলেন, 'আপনি ইবনুল মুবারককে একটি হাদিস শোনাতে বলুন।' তখন হাম্মাদ ইবনু যায়িদ তাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আবু আব্দির রহমান, তালিবে ইলমরা আপনাকে হাদিস শোনাবার অনুরোধ করছে। আপনি প্রস্তুত তো?' উত্তরে ইবনুল মুবারক বলেন, 'হে আবু ইসমাইল, আপনি থাকতে আমি হাদিস শোনাব! এ আমি পারব না।' হাম্মাদ বলেন, 'আল্লাহর দোহাই! আপনিই শোনান।'

তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলতে শুরু করেন, 'আবু ইসমাইল, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন...। এভাবে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কেবল হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত হাদিসগুলোই বলতে থাকেন।'[৪]

---

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, শারানি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬০

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৫

এমন অভূতপূর্ব স্মরণশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারণত মুখস্থ হাদিস বর্ণনা করতেন না। ইলমি আমানতের যারা হকদার, তাদের কাছে যথাযথভাবে ইলম পৌঁছে দেওয়ার এটাই সবচেয়ে সঠিক ও নিরাপদ পদ্ধতি। তার ওপর সেই আমানত যদি হয় প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, সেক্ষেত্রে এমন সতর্কতা অবলম্বন করা তো একান্ত জরুরি।

শাস্ত্রীয় পারদর্শিতা

হাদিসশাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর দক্ষতা ছিল সুদক্ষ জহুরির মতো। তিনি হাদিসের সনদ ও বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খুব সহজেই বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। মূল হাদিসের শব্দে কিংবা বাক্যে সামান্যতম হেরফের হলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলতে পারতেন। তার এই অনন্য যোগ্যতাই তাকে হাদিসশাস্ত্রের বিশাল মহিরুহে রূপান্তরিত করেছিল। মুহাদ্দিসগণের আশ্রয় ও ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছিলেন।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, তৎকালীন মুহাদ্দিসরা হাদিস-বিষয়ক কোনো সমস্যায় পড়লে নিঃসংকোচে তার শরণাপন্ন হতেন। হাদিসের সনদ বা মতন বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, তার সাহায্যে মীমাংসা করে নিতেন এবং তাকে হাদিসশাস্ত্রের 'বিশারদ' বলে গণ্য করতেন। ফযালা আত-তুনিসি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি কুফার মুহাদ্দিসদের সঙ্গে ওঠাবসা করতাম। তাদের মজলিসে নিয়মিত অংশ নিতাম। কখনো কোনো হাদিস নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তারা একে অপরকে বলতেন, 'চলো, আমরা হাদিসের ডাক্তার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছে যাই।'[১]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনু আদম বলেন, 'জটিল কোনো বিষয় সামনে এলে, আমি সাধারণত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের রচনাসমগ্র থেকে সমাধান বের করার চেষ্টা করি। সেখানে পেয়ে গেলে রবের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আর না পেলে সবর-ই হয়ে দাঁড়ায় আমার একমাত্র সঙ্গী।'[২]

---

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৬

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৬

একদিন খলিফা হারুনুর রশিদ এক মুরতাদকে পাকড়াও করে শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী তখন বলে ওঠে, 'মহামান্য খলিফা, আপনি কেন আমায় এমন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন?'

খলিফা বলেন, 'তোদের মতো ধর্মত্যাগীদের ফিতনা থেকে আল্লাহর বান্দাদের রক্ষা করার জন্য।'

লোকটি তখন উপহাসের সুরে বলতে থাকে, তা-ই যদি হয়, তবে আমি যে এক হাজার মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিস সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছি, সেসব থেকে তাদেরকে কীভাবে রক্ষা করবেন, জনাব?'

খলিফা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি আবু ইসহাক আল-ফাযারি আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নাম শুনিসনি? তারা তোর প্রতিটা জাল হাদিস খুঁজে বের করে ভাগাড়ে ফেলবে! তারা জীবিত থাকতে তোর মতো লোকদের সকল ষড়যন্ত্র মাঠে মারা যাবে!'[১]

হাদিসের রাবি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা

ইবনু উদায়দিল্লাহ আর-রাযির সূত্রে হিশাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'একদিন আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করি, মুগিরাহ ইবনু শুবার সূত্রে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য? জারির?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না, আবু আওয়ানা।'

সাইদ ইবনু সালিহ বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক হামাদান শহরে এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটা তখন ইয়াজিদ ইবনু যুরাইয়ের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করছে। ইবনুল মুবারক তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মাশা আল্লাহ, এমন ব্যক্তিদের হাদিসই বর্ণনা করা উচিত।'

ইবরাহিম ইবনু ঈসা আত-তালিকানি বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারককে শিহাব ইবনু খিরাশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, ইবনু খিরাশ একজন নির্ভরযোগ্য রাবি।'

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৫২

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, ‘কোনো রাবি সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত না হলে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার হাদিস বর্জন করতেন না। অবশ্য আরোপিত অভিযোগের প্রমাণ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তার হাদিস ছুড়ে ফেলে দিতেন এবং তার ব্যাপারে অন্যদের সতর্ক করে দিতেন।’

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বলেন, ‘আমি ইবনুল মুবারককে দেখেছি, তিনি জাফর ইবনু মুহাম্মাদের কাছ থেকে উমার ইবনু হারুনের হাদিস শোনার ব্যাপারে আপত্তি জানাতেন। উমার ইবনু হারুন প্রায় সত্তরটি হাদিস বর্ণনা করেছিল জাফর ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে।’

হাসান ইবনু ঈসা বলেন, ‘ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আইয়ুব ইবনু খুতের হাদিস বর্জন করেছেন।’

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ ইবনু সালিমের হাদিস বর্জন করো।’

ইয়াহইয়া ইবনু আদম একদিন ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নাসর ইবনু তরিফ ও উসমান আল-বারির মধ্যে কে আপনার বেশি পছন্দের?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘একজনও না।’[১]

হাদিস যাচাইয়ে দক্ষতা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আবু সালামা এবং তার থেকে ইমাম যুহরি মারফু[২] সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ—অর্থাৎ, সালাত শেষে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ সংক্ষিপ্ত লয়ে পড়া সুন্নাত।[৩]

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বলেন, ‘ঈসা ইবনু ইউনুস ওপরের হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করতেন। এটা জানতে পেরে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ একদিন তাকে

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত-তাদিল*, ইবনু আবি হাতিম, পৃষ্ঠা : ২৬৯-২৭৪

[২] যেসব কথা, কাজ কিংবা অনুমোদন সরাসরি নবিজির সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে মারফু বলা হয়।

[৩] *জামি তিরমিযি* : ২৯৪

এভাবে হাদিসটি বলে বেড়াতে নিষেধ করেন। এরপর থেকে তিনি আর কখনো হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেননি।'

কাওকাল ইবনু মাতহার বলেন, 'কুফায় হাবিব আল-মালিকি নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। মুহাদ্দিসগণের সান্নিধ্য পাবার কারণে সমাজে তার বিশেষ সুনাম ছিল। একদিন আমি তার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে বলি, তাকে প্রায়ই একটি গরিব[১] হাদিস বর্ণনা করতে দেখা যায়। তিনি সেই হাদিসটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, ইমাম আমাশ যায়িদ ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো কাজ। তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানো সুন্নাতের পরিপন্থি।'

হাদিসটি শুনেই তিনি বলে ওঠেন, 'এই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই।'

আমি নিশ্চিত হবার জন্য বার কয়েক তাকে একই প্রশ্ন করি। তিনিও প্রতিবার একই উত্তর দেন। তারপরও শেষবারের মতো আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত তো?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'এই হাদিসটি ছাড়া বাকি সব বিষয়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।'

তার এই দৃঢ়তা দেখে জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'হাবিব আল-মালিকি তো অত্যন্ত সৎ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি।' জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কেবল এই হাদিস ছাড়া অন্য সবকিছুতে তিনি সৎ ও আস্থাভাজন।'[২]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেন, 'একবার ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর সামনে সলম ইবনু সালিমের একটি হাদিস পেশ করা হলে তিনি বলেন, এটা তো সলমের পেলে-পুষে বড় করা এক বিচ্ছু! অর্থাৎ, এটা তার নিজের বানানো হাদিস। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চান।'

মিযানুল ইতিদাল গ্রন্থে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সলম ইবনু সালিমের হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, সলমের পোষা বিষধর সাপগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্ব

---

[১] যে সহিহ হাদিসটি কোনো এক কালে মাত্র একজন রাবি বর্ণনা করেছেন তাকে গরিব হাদিস বলে।

[২] *কিতাবুল জারহি ওয়াত তাদিল*, ইবনু আবি হাতিম আর-রাযি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৬২

বজায় রেখো। এগুলো যেন কখনো তোমাকে দংশন না করে।'[১]

ইবরাহিম ইবনু ঈসা আত-তালিকানি বলেন, একদিন আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করি, 'একজন কি আরেক জনের পক্ষ থেকে সালাত কিংবা সিয়াম আদায় করতে পারবে?' তিনি উত্তর দেন—

'সাদাকা করার ব্যাপারে কারও মতবিরোধ নেই। তবে সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য শারীরিক ইবাদতের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।'

'কিন্তু হাদিসে যে বলা হয়েছে, নিজে সালাত ও সিয়াম পালনের পাশাপাশি মা-বাবার জন্যও সালাত-সিয়াম পালন করা তাদের প্রতি সদাচারের অংশ-বিশেষ। এই হাদিসের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?'

'হাদিসটি কার সূত্রে বর্ণিত?'

'শিহাব ইবনু খিরাশের সূত্রে।'

'হুম, নির্ভরযোগ্য। তিনি কার সূত্রে বর্ণনা করেন?'

'হাজ্জাজ ইবনু দিনারের সূত্রে।'

'হুম, নির্ভরযোগ্য। তিনি কার সূত্রে বর্ণনা করেন?'

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে।'

'শোনো, আবু ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনু দিনার এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে বহু বছরের ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধান অতিক্রমের জন্য একাধিক রাবির প্রয়োজন। কারণ, হাজ্জাজ ইবনু দিনার হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষদিকের রাবি। কাজেই কমপক্ষে ২/৩ জন রাবির মাধ্যম ছাড়া তিনি রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তিনি যেহেতু সনদের এখানে বাকি অংশগুলো উল্লেখ করেননি, সেহেতু হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়।'[২]

উবাই ইবনু কাব বিভিন্ন সুরার অতিরিক্ত ফজিলত-সংক্রান্ত একাধিক হাদিস বর্ণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার এই হাদিসগুলো সম্পর্কে বলতেন, 'আমার

---

[১] *মিযানুল ইতিদাল*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৮৫

[২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৬

ধারণামতে, ধর্মচ্যুত লোকেরা এসব ইচ্ছেমতো বানিয়েছে।'[১]

হাদিস যাচাইয়ে ইবনুল মুবারকের এই দক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত। কাজেই কোথাও কারও কোনো হাদিস গ্রহণ কিংবা বর্জন নিয়ে সংশয় দেখা দিলে, তৎকালীন মুহাদ্দিসগণ নির্দ্বিধায় তার শরণাপন্ন হতেন এবং তার কাছ থেকেই সঠিক সমাধান পাওয়ার আশা করতেন। অনেক উঁচু মাপের মুহাদ্দিসও তার মতকে নিজেদের মত হিসেবে একবাক্যে মেনে নিতেন। নিচের ঘটনাগুলো থেকে খুব সহজেই আমরা এই তথ্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব।

একবার আব্দুর রহমান ইবনু মাহদিকে ইউনুস আল-আইলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ইবনুল মুবারক বলেছেন, তার হাদিসগুলো সহিহ। তাই আমিও বলছি, তার হাদিসগুলো সহিহ।'[২]

ইমাম বুখারিও তার কথার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিতেন। *তাহযিবুত তাহযিব* গ্রন্থে আইয়ুব ইবনু খুতের জীবনীতে এসেছে, ইমাম বুখারি তার সম্পর্কে বলেন, ইবনুল মুবারক তাকে পরিত্যাগ করেছেন।'[৩]

অনুরূপ মুহাম্মাদ ইবনু সালিম আল-হামদানী সম্পর্কে ইমাম বুখারি বলেন, 'মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করলেও ইবনুল মুবারক তার হাদিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৪]

মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দিল্লাহ আল-আরযামি নামের এক ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম বুখারি বলেন, 'ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ও ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন।'[৫]

---

[১] *তাওয়িলু মুখতালাফিল হাদিস*, পৃষ্ঠা : ৮৬

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত-তাদিল*, ইবনু আবি হাতিম, পৃষ্ঠা : ২৬৯-২৭৪

[৩] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪০২

[৪] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ১৭৭

[৫] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা : ৩২৩

ফিকহশাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করলেও; তার ফকিহ-সত্তা কোনো অংশেই মুহাদ্দিস-সত্তার তুলনায় কম উজ্জ্বল ছিল না। ইবনুন নাদিম রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *আল-ফিহরিসত* গ্রন্থে তাকে ওই সকল বিখ্যাত মনীষীর কাতারে শামিল করেছেন, যারা ছিলেন একই সঙ্গে বিজ্ঞ ফকিহ ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। সব্যসাচী হবার কারণেই ফকিহ ও মুহাদ্দিস উভয়ের চরিতাভিধানে আমরা তার নাম খুঁজে পাই। তখন মানসপটে ফিকহ, হাদিস ও সাহিত্যের সমন্বয়কারী অনন্য এক মনীষীর জলছবি ভেসে ওঠে। হৃদয়টা আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারক ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবি ও নির্ভরযোগ্য ফকিহ।'[১]

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি একজন বিজ্ঞ ফকিহ ও বিশিষ্ট আলিম।'[২]

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি একজন ফকিহ ও হাফিযুল হাদিস ছিলেন।'[৩]

---

[১] *তাকরিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৪৫

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[৩] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৭

ইবরাহিম ইবনু শাম্মাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। সবচেয়ে বড় মুত্তাকি হচ্ছেন ফুযাইল ইবনু ইয়ায আর সবচেয়ে বড় হাফিযুল হাদিস হচ্ছেন ওয়াকি ইবনুল জাররাহ।'[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি মক্কায় অবস্থানকালে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একবার সেখানে আগমন করেন। বিদায়ের মুহূর্তে ফুযাইল ইবনু ইয়ায এবং সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা তার সাথে কিছু দূর এগিয়ে যান। তখন তাদের একজন মন্তব্য করেন, এই মনীষী প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ফকিহ। অপরজন বলেন, তিনি শুধু প্রাচ্যের নন; বরং প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফকিহ।'[২]

ইবনুল মুবারকের প্রতি মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ—সালাফদের কেউ কখনো তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেননি। আবু উমার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার জানামতে, কোনো ফকিহই সমসাময়িক কিংবা পরবর্তীদের সমালোচনা থেকে মুক্ত নন। তবে এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বিরল ব্যতিক্রম। সালাফ বা খালাফদের কেউ কখনো তার সমালোচনা করেননি।'[৩]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৪

[২] *তাযকিরাতুল হুফফায,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৫৬

[৩] *আল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮২

যেমন ছিলেন তিনি

ইলম ও আমল

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জ্ঞানের পরিধি ও নানাবিধ যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই ধারণা পেয়েছি। এখন আমরা তার আমল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। কারণ, আমলহীন নিরস ইলমের কোনোই মূল্য নেই মহান রবের কাছে। অধিকন্তু তিনি প্রায়শই বলতেন, 'ইলম আমলের সহায়ক মাত্র। আমল ছাড়া রাশি রাশি ইলমের দু-পয়সা দাম নেই।' আব্দুল্লাহ ইবনুল মুতায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমলবিহীন ইলম ফলবিহীন বৃক্ষের মতো।'[১]

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রিয় বৎস! আমল না করে নিছক ইলম অর্জন করা একপ্রকার দাম্ভিকতা; আবার ইলম ছাড়া আমল করাও একপ্রকার ধৃষ্টতা।'[২]

ইলম অর্জন করার পর কেউ যদি সে অনুপাতে আমল না করে, তবে এই ইলমই তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এর দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই লাভ করা যায় না। ইলমের সাথে আমল এবং শিক্ষার সাথে দীক্ষার মিশেল না হলে—শিক্ষাই একসময় অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়! ইবনুল মুবারকের মতে, ইলমের

---

[১] *ইকতিযাউল ইলমি আল আমাল*, খতিব বাগদাদি

[২] আইয়্যুহাল ওয়ালাদ

সাথে সাথে আমলের পরিমাণটাও বাড়াতে হবে। অন্যথায় এই ইলম ইহজীবনে কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

চলুন, এবার তবে দেখা যাক, যুগশ্রেষ্ঠ এই আলিমের আমল কেমন ছিল এবং এই আমল তার জীবনে কী কী সুফল বয়ে এনেছিল—

যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা

সালাফদের মধ্যে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব—যার মাঝে সকল প্রকার প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তার জীবন যেন এক ফুটন্ত বেলী ফুল। যে ফুল চারদিকে সুরভি ছড়ায়; হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং চিত্তকে বিমোহিত করে। ইসমাইল ইবনু আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পৃথিবীতে আজ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো কেউ নেই। মহান আল্লাহ তাকে সব রকমের ইতিবাচক গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।'[১]

বস্তুত যে ব্যক্তি জীবনের ছোট বড় প্রতিটি কাজে কুরআন-সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, মহান আল্লাহ তার মাঝে ইতিবাচক গুণাবলির বীজ বুনে দেন এবং মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। তখন মানুষ তার অনুসরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা করে এবং তার ভালোবাসাকে আশ্রয় করে মহান আল্লাহর কাছে নিজেদের প্রয়োজন প্রার্থনা করে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবাদত, তাকওয়া ও জিহাদের মাধ্যমে নিজেকে ঠিক এই অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

তার এই গুণসমূহ বিচার করে প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক ও সাহাবিদের গুণাগুণ পর্যালোচনা করে দেখেছি—নবিজির সান্নিধ্য ও তার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতীত ইবনুল মুবারকের ওপর তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'[২]

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আব্বাসি-শাসনামলের বেশ বড় একটি সময়কাল পেয়েছেন। এই সময়টাতে মুসলিমদের মাঝে পার্থিব লালসা ও অর্থবিত্তের প্রাচুর্য

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৭

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৩

দেখা দেয়। মানুষ ধনী ও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। ফলে এক শ্রেণির মোড়ল ও জমিদারদের উত্থান ঘটে। শুরু হয় নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতন। ঈমানি শক্তি ও দ্বীনি চেতনা লোপ পেতে থাকে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং দ্বীনের ব্যাপারে গাফিল হতে শুরু করে। অথচ এই পার্থিব মোহ মুসলিমদের জন্য বহিঃশত্রুর চেয়েও বেশি ভয়ংকর ও অতিমাত্রায় বিপজ্জনক। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন—'আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ব্যাপারে আশঙ্কা করি না; বরং আমি আশঙ্কা করি, অতীতের লোকদের মতো তোমরাও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে; প্রাচুর্যের লালসায় মেতে উঠবে। এরপর তাদের মতো তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।'[১]

নবিজির এই আশঙ্কার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে ইবনুল মুবারকের যুগে। মানুষ তখন অর্থসম্পদ বৃদ্ধির কারণে আনন্দ-ফুর্তি, ভোগবিলাস ও অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে বেশ কজন আল্লাহভীরু ও দুনিয়াবিমুখ সমাজ সংস্কারক আলিমের আবির্ভাব ঘটে দুনিয়ার বুকে। তারা মানুষের আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি ইসলাম ও ইলমের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। নিজেদের জীবিকা এবং ধর্মীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেরাই অর্থের ব্যবস্থা করে থাকেন।

তারা কখনো বিত্তশালীদের দ্বারস্থ হননি। হাদিসের দারস, মসজিদ কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য তথাকথিত দানবীরদের সামনে তাদের নতজানু হয়ে বসতে হয়নি। জীবিকা কিংবা দ্বীনি কাজের প্রয়োজনে দুনিয়াদারদের কাছে হাত পাততে হয়নি। আর এটাই ছিল তাদের সমাজ সংস্কারের নিয়ামক শক্তি ও প্রধান হাতিয়ার। এই মহৎ মানবদের একজন হলেন আমাদের প্রিয় ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ।

প্রকৃত যুহদ

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, যুহদ বা ত্যাগ-তপস্যা কী? সোজা উত্তর দেবে, যুহদ মানে দুনিয়াবিমুখতা; যাবতীয় ব্যস্ততা ফেলে জনবিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। কেবল ইবাদত ও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা। দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা। খাবার ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে ধনী ও বিত্তশালীদের দান-সাদাকাই যথেষ্ট। এক কথায়, দুনিয়া অন্যদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; দ্বীনদার ও দুনিয়াবিমুখীদের জন্য নয়।

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪০১৫

কিন্তু আপনি যদি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো অনুসরণীয় ব্যক্তিদের দিকে তাকান, তবে যুহদের এমন অর্থ তাদের অভিধানজুড়ে কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাদের মতে যুহদ হচ্ছে, দুনিয়ার অর্থসম্পদের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারস্থ না হওয়া। বড় বড় ধনী ও দুনিয়াপ্রেমীর দান-দক্ষিণার বিনিময়ে নিজের ইলম, লেবাস ও দ্বীনদারির মান-মর্যাদা বিসর্জন না দেওয়া। দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে পকেটের ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রাখা। তবেই ইবাদতে আসবে পরিতৃপ্তি, মনে আসবে প্রশান্তি। সালাতে দাঁড়ালে নিজের বা পরিবারের অন্নবস্ত্রের চিন্তা মাথায় ভর করবে না। বিত্তশালী কারও পকেটের দিকে নজর যাবে না। নিজেকে তাদের ঠাট্টা বা করুণার পাত্র বানাতে হবে না।

এক কথায়, তাদের দৃষ্টিতে যুহদ হচ্ছে চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা। সামান্য দুনিয়ার জন্য সমস্ত আত্মমর্যাদাবোধ জলাঞ্জলি দেওয়ার পরিবর্তে কাজ করে উপার্জন করা।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রথমে ইলম অর্জন করেছেন। এরপর ইসলামি বিধান অনুযায়ী হালাল ব্যবসায় সেই ইলমের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। রিযক অন্বেষণ করে তা যথাযথভাবে ব্যয় করেছেন আল্লাহর পথে। গরিব ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যুহদ বলতে তিনি এমনটাই বুঝেছেন। পরিশ্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ব্যবসা করেছেন। কিন্তু অর্জিত অর্থসম্পদ সিন্দুকে ভরে রাখেননি। বড়লোকদের মতো আয়েশ ও ভোগবিলাসেও মত্ত হননি; বরং এর মাধ্যমে রক্ষা করেছেন ইলমের মর্যাদা। দান-সাদকায় ব্যয় করেছেন এবং আত্মসম্মান বজায় রেখে ইবাদতে নিমগ্ন থেকেছেন।

হালাল ব্যবসা

ইসলাম কখনো সম্পদ অর্জনে বাধা দেয় না কিংবা অনুৎসাহিত করে না। মহান আল্লাহ বলেন—

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...۝٢٧٥

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। আর সুদকে করেছেন হারাম।[১]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫

মহান আল্লাহর এই ঘোষণা অনুসারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও অনেক সাহাবি ব্যবসা করেছেন। কাজেই বলা যায়, ব্যবসা নবিজি ও তার সাহাবিদের পবিত্র সুন্নাহ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই ব্যবসা যেন মানুষকে আল্লাহ ও আখিরাতবিমুখ করে না দেয় এবং অর্জিত সম্পদে গরিবের হকের কথা ভুলিয়ে না দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...﴿٣٧﴾

তারা এমন লোক—যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় আল্লাহর যিকির, সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারে না...।[১]

ইবনু আতা আস-সিকান্দারি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে মুমিনদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত মুমিন তারা প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, নানান পেশায় নিয়োজিত থাকে; তবে তাদের পেশাগত ব্যস্ততা তাদেরকে দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে সরাতে পারে না। বরং দান-সাদাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের পথ সহজ করে দেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'হালাল সম্পদ একজন সৎব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপার্জন।'[২]

কুরআন ও হাদিসের এই নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহাবি ও সালাফগণ ব্যবসাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখতেন; সম্পদকে মূল্যায়ন করতেন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ উপার্জন হিসেবেই। এজন্যই তারা গাঁটে কিংবা গৃহে অঢেল অর্থসম্পদ রেখেও হৃদয়টাকে সুমহান রবের সমীপে সঁপে দিতে পারতেন। অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করতেন। প্রাচুর্য ও সচ্ছলতায় শোকরগুজার হতেন। কখনো কোনোরূপ অহমিকা থাকত না তাদের মাঝে।

আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কেউ যদি আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তবু সে প্রকৃত যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ। অপরদিকে কেউ যদি দুনিয়াবি কোনো স্বার্থে দুনিয়ার সকল সুখ-ঐশ্বর্য

---

[১] সুরা নূর, আয়াত : ৩৭

[২] *আল আদাবুল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ২৯৯; *বায়হাকি* : ১২৪৮

ত্যাগ করে, তবু তাকে দুনিয়াবিমুখ বলা যাবে না।'[১]

পেশা যখন ব্যবসা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হয়তো তার শ্রদ্ধেয় পিতা কিংবা প্রিয় উস্তায ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে দেখে এই পেশায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কারণ, তারা দুজনেই ব্যবসা করতেন। তাছাড়া তিনি ইমাম আবু হানিফার সংস্পর্শে থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং ব্যবসার খুঁটিনাটি সবকিছু বুঝে নিয়েছেন। এভাবেই ইবনুল মুবারক নিজেকে একজন প্রখ্যাত আলিম ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মৌলিক তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন—

- নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা; কারও দান-দক্ষিণা বা করুণার পাত্র হওয়ার নীচতা থেকে রক্ষা করা এবং ধনীদের অনুদানের সামনে ইলমের মর্যাদা ও আত্মসম্মান ভূলণ্ঠিত হতে না-দেয়া। কারণ, সৌজন্য ও আত্মমর্যাদা বজায় রেখে ধনিকশ্রেণির অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারলে, তাদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়। ভোগ-বিলাসে মত্ত জাতিকে সংযম, আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিরাগের সবক দেওয়া যায়। অর্থসম্পদে গরিবদের ন্যায্য হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়। সর্বোপরি অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও কীভাবে নিজে অভুক্ত থেকে গরিবদের মুখে হাসি ফোটানো যায়—জাতির মধ্যে সেই বোধ ও চেতনা জাগ্রত করা।

- ব্যবসা হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলামি আইনবিদ হওয়ার কারণে তার প্রধান কর্তব্য ছিল বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটানো। ফিকহশাস্ত্রের অন্যতম পাঠ 'কিতাবুল বুয়ু' তথা ক্রয়-বিক্রয়-সম্পর্কিত অধ্যায়। এই অধ্যায়ের বেশির ভাগ মাসআলা ও নিয়মনীতিই এমন যে, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করলে সেগুলোর যথার্থতা উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও পরিভাষা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি না থাকলে এসব নিয়মনীতি বোঝা বেশ কষ্টকর। তাই তিনি চেয়েছিলেন বাস্তব জীবনে ইসলামি অর্থনীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে।

---

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৬৪

তখনকার সময়ে উম্মাহর বড় একটি অংশ ইলমচর্চা ও জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন। ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে হাদিস ও ফিকহের বিশুদ্ধ ইলম পৌঁছে দেওয়া ছিল তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবিকা নির্বাহের কোনো ধরনের অবলম্বন ছিল না তাদের। স্বভাবতই তাদের এমন কোনো বিত্তশালী ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে হতো, যিনি তাদের আর্থিক দিকটায় লক্ষ রাখবেন। তাদের পারিবারিক খরচের জোগান দেবেন। মহান আল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে এই মহৎ কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তিনি জগদ্‌বিচ্ছিন্ন জ্ঞানপিপাসু ও আবিদদের পেছনে অকাতরে ব্যয় করতেন। ব্যবসা থেকে উপার্জিত সমস্ত অর্থ বিলিয়ে দিতেন তাদের মাঝে। পরিবারের জন্য তেমন কিছু রাখতেন না বললেই চলে।

দুনিয়াবিমুখ সম্পদশালী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর ব্যবসায় আশ্চর্যরকম বারাকাহ দান করেছিলেন। তার মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় চার লক্ষ দিরহাম। এখান থেকে তার বাৎসরিক আয় হতো এক লক্ষ দিরহাম। এত বেশি উপার্জন খুব একটা দেখা যেত না সে সময়। তিনি আয়ের পুরোটাই অভাবগ্রস্ত, ইবাদতগুজার, জ্ঞানচর্চাকারী ও আলিমদের পেছনে ব্যয় করতেন। প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে মূলধন থেকেও খরচ করে ফেলতেন।[১]

সফরে কিংবা হজের উদ্দেশ্যে বের হলে এক উট-বোঝাই খাবার নিয়ে বের হতেন। খাবারের মধ্যে মোরগের গোশত, মেষের গোশত, উটের গোশত এবং বিভিন্ন জাতের মিষ্টি খাবার থাকত। তিনি এই সম্পূর্ণ খাবার সফরসঙ্গীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু নিজে দিনের পর দিন সিয়াম রাখতেন; প্রচণ্ড গরমের মৌসুমেও সিয়াম ত্যাগ করতেন না।[২]

একবার মক্কায় যাওয়ার পথে মিসরের একটি কাফেলা তার সঙ্গী হয়। তিনি সারাটা পথ জুড়ে তাদেরকে খেজুর ও ঘিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করান। কিন্তু নিজে সেদিন সিয়ামরত ছিলেন।[৩]

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৭

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৮

[৩] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৭

মনে রাখতে হবে, মানুষ গরিব হলেই দুনিয়াবিমুখ হয়ে যায় না। এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের পকেট একেবারে শূন্য অথচ অন্তরটা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। ফলে সুযোগ পেলেই তারা লুটতরাজ, আত্মসাৎ ও রাহাজানি করে বেড়ায়। অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায়। আবার অর্থসম্পদ পেলেই যে মানুষ সভ্য ও সুশীল হয়ে উঠবে, তাও কিন্তু নয়। সম্পদের কারণে বহু মানুষ পাপ ও অশ্লীলতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। অর্থবিত্তের অপব্যবহার শুরু করে। এদের জন্য সচ্ছলতার নিয়ামত এক মহাপরীক্ষা। তখন অর্থের পাশাপাশি তাদের পাপের পরিমাণও বেড়ে যায়।

কাজেই দুনিয়াবিমুখ ধনী কিংবা গরিব কেবল তাদেরই বলা যায়, যারা এই দুই ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত থাকে—অভাবে স্বভাব নষ্ট করে না; আবার সচ্ছলতার স্বেচ্ছাচারে মেতে ওঠে না। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন এই মাপের দুনিয়াবিমুখ। আর এক্ষেত্রে তার আদর্শ ছিলেন হযরত উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-সহ আরও অনেকে। তারা সকলেই অর্থসম্পদ, দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহভীতি ও সৎকাজের মাঝে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মর্তব্য যে, খুব বেশি সরল জীবনযাপন—আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিরাগের মাপকাঠি নয়। কারণ, আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যাদের পরনে থাকে ছেঁড়া কাপড়, যারা রাত কাটিয়ে দেয় মাটির বিছানায়, রুটি খায় পানিতে ভিজিয়ে; অথচ তাদের মনের গহীনে জ্বলজ্বল করতে থাকে লোভ-লালসার আগুন। বিত্তশালীদের পকেট থেকে টাকা বের হতে দেখলে তাদের চোখগুলো চকচক করে ওঠে।

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব অর্থসম্পদ পেয়ে আনন্দিত হন না; আবার এগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে আফসোসও করেন না—তিনিই প্রকৃত সাধক ও দুনিয়াবিমুখ।'[১]

সারকথা, যুহদের সম্পর্ক অন্তরের সাথে; বাহ্যিক বেশভূষার সাথে নয়। কবির ভাষায়—

[১] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ভূমিকা; *তারতিবুল মাদারিক*, কারি ইয়ায, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪০

মন যদি ছুটোছুটি করে সদা ভাই
নির্জন কুটিরবাসে কোনো লাভ নাই,
স্রষ্টার প্রেম যদি মনে থাকে জাগি
ঐশ্বর্যের মাঝে তুমি সংসার-বিরাগী।

উদারতা ও বদান্যতা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার সমস্ত অর্থসম্পদ ব্যয় করেছেন আল্লাহর পথে। অভাবগ্রস্ত সাধারণ মানুষ, কপর্দকশূন্য মুহাদ্দিস এবং দ্বীনের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ আলিমগণের মাঝে অকাতরে বণ্টন করে দিতেন। তার এই বদান্যতা এ কারণে সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে যে, তিনি নিজে কষ্ট করে মাথার ঘাম পেয়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাননি। আর সে সম্ভাবনাও তার ছিল না। কেননা, তার পিতা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না। ছিলেন একজন নগণ্য ক্রীতদাস। মালিকের বাগানে কামলা খাটতেন। আবার ইবনুল মুবারকের এই অর্থবিত্ত আমির-উমারা কিংবা শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে পাঠানো উপহারও ছিল না। কেননা, সারা জীবন তিনি রাজদরবার ও ক্ষমতাশীলদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

এতৎসত্ত্বেও তার উপার্জন ও দান ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়। একবার তিনি ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি ও আপনার সঙ্গীরা না থাকলে, আমি হয়তো কখনোই ব্যবসায় জড়াতাম না। কারণ, আমার এই ব্যবসা নিজের জন্য নয়; আপনাদের মতো পুণ্যবান মানুষগুলোর সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থার জন্য। এজন্যই আমি দূরদূরান্তে ব্যাবসায়িক সফর করে থাকি।[১]

অবশ্য তিনি সবসময় শুধু অর্থদান করেই ক্ষান্ত হতেন না; কখনো কখনো অভাবগ্রস্তকে অর্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দান করতেন। একদিনের ঘটনা : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, প্রায় সাত বছর আগে আমার ঘাড়ে একটি বিষফোঁড়া দেখা দিয়েছে। সব রকমের চিকিৎসা করেও কোনো ফল পাইনি। বড় বড় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উত্তরে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এক কাজ করো। মরুভূমির বুকে এমন কোনো

---

[১] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬

জায়গা খুঁজে বের করো, যেখানে তৃষ্ণার্ত পথিকদের পিপাসা মেটানোর প্রয়োজন পড়ে। তারপর সেখানে সাদাকায়ে জারিয়াস্বরূপ একটি কূপ খনন করো—যাতে মানুষজন সেখান থেকে পানি পান করে তোমার জন্য মন খুলে দুআ করতে পারে। হয়তো এই অসিলায় তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।' লোকটি তার কথামতো একটি কূপ খনন করল। এর কিছুদিন বাদেই আল্লাহর ইচ্ছায় সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল।[১]

একবার তার সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলা হয় যে, তিনি নিজের শহর বাদ দিয়ে অন্য শহরে বেশি দান করেন। জবাবে তিনি বলেন, 'আমি এমন একদল নিঃস্বার্থ মানুষের সন্ধান পেয়েছি, যারা সর্বদা হাদিস অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে উপকৃত হয়। আমি তাদের অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিলে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে ইলম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তাদের পেছনে ব্যয় করলে উম্মাতে মুহাম্মাদি ইলমের বিশাল রত্ন-ভান্ডারের সন্ধান পাবে। নবুওয়াতের পর ইলমের প্রচার-প্রসারের চেয়ে ভালো কোনো কাজ আছে বলে আমার জানা নেই।[২]

তিনি প্রায়শই খেজুর নিয়ে ইয়াতিম ও অসহায় শিশুদের কাছে যেতেন। তাদের বলতেন, 'যে আমার কাছ থেকে যতগুলো খেজুর নেবে, বিনিময়ে আমি তাকে ততগুলো দিরহাম দেবো।' তার এমন অভাক করা ঘোষণা শুনে সবাই ছুটে আসত। ইচ্ছেমতো খেজুর নিত। খাওয়া শেষ হলে তিনি খেজুরের দানা হিসেব করে প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে দিরহাম দিতেন। যাদের মস্ত বড় এক কলিজা রয়েছে, কেবল তারাই পারে এভাবে খুঁজে খুঁজে দান করতে।[৩]

---

[১] *বায়হাকি; আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭৪*

[২] *তারিখু বাগদাদ, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬০*

[৩] *কুনুযুল আউলিয়া, পাণ্ডুলিপি : ৮৫*

কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা

■ একবার তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে রোমের সীমান্তবর্তী শহর মাসসিসার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একদল সুফিসাধক স্বপ্রণোদিত হয়ে তার সাথে যোগ দেন। তিনি তাদের বলেন, 'আপনারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি। কাজেই কেউ আপনাদের পেছনে ব্যয় করলে আপনাদের আত্মমর্যাদায় লাগবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই আমি আপনাদের জন্য সম্মানজনক একটি উপায় বের করেছি।' এ কথা বলে, তিনি খাদেমকে একটি পাত্র আনতে বলেন। পাত্র আনা হলে তিনি একটি রুমাল দিয়ে পাত্রটি ঢেকে দেন। এরপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আপনাদের কাছে যে দিনার-দিরহামগুলো রয়েছে তা এই পাত্রটিতে রাখুন।' তার কথামতো প্রত্যেকে নিজেদের অর্থকড়ি সেখানে রাখতে শুরু করে। কেউ ২ দিরহাম, কেউ ১০ দিরহাম, কেউ আবার ২০ দিরহাম রাখে। মাসসিসা শহরে পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি সকলের খাবারদাবার-সহ যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে থাকেন। সেখানে পৌঁছানোর পর বলেন, 'এ শহর থেকেই আমাদের যুদ্ধযাত্রা শুরু হবে। আসুন এই পাত্রের বাকি অর্থকড়িগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই।' সবাই ভেবেছিল, এই দীর্ঘ সফরে তাদের সব অর্থ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেল, ইবনুল মুবারক প্রত্যেককে ২০ দিনার[১] করে দিচ্ছেন! একজন অবাক হয়ে বলে ওঠে, 'হে আবু আব্দির রহমান! আমি তো দিয়েছিলাম মাত্র ২০ দিরহাম[২]?' উত্তরে তিনি বলেন,

---

[১] স্বর্ণমুদ্রা

[২] রৌপ্যমুদ্রা

'মুজাহিদের সম্পদে আল্লাহ বারাকাহ দিলে সেটা কি ফেরানো যায়?'[১]

■ আরেক দিনের ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের হজে যাওয়ার কথা জানতে পেরে মার্ভ শহরের হজগমনে ইচ্ছুক লোকেরা তার কাছে ছুটে আসেন। নিজেদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বলেন, 'এবারের হজ আমরা আপনার সাথে করতে চাই।' তিনি বলেন, 'বেশ! তবে আমার সঙ্গে যেতে হলে তোমাদের প্রত্যেকের খরচের পয়সা আলাদা আলাদা খামে ভরে আমার কাছে জমা রাখতে হবে আর খামের ওপর স্পষ্ট করে নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে হবে। আমি নিজ দায়িত্বে সেখান থেকে তোমাদের জন্য খরচ করব।' আগ্রহীরা এই শর্ত সানন্দে মেনে নেয়। নাম-ঠিকানা লিখে টাকাসমেত খাম জমা দেয় তার কাছে। তিনি সেগুলো একটি সিন্দুকে রেখে বেরিয়ে পড়েন সফরে।

সারা পথ সহযাত্রীদের বাহন ও খাবারের খরচ তিনি একাই বহন করেন। হজ শেষ হওয়ার পর সবাইকে নিয়ে মদিনা-মুনাওয়ারায় যান। সেখানে গিয়ে প্রত্যেককে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার পরিবার কি মদিনা থেকে কিছু নিয়ে যেতে বলেছে?'

উত্তরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রিয়জনের সখ ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বাজারে গিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো কিনে দেন। এরপর সবাইকে নিয়ে ফিরে আসেন মক্কা-মুকাররমায়। সেখানেও প্রত্যেকের কাছে আলাদাভাবে জানতে চান, মক্কা থেকে কিছু কিনে দিতে হবে কি না।

এভাবে দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল সফর শেষে মার্ভ শহরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শহরের কাছাকাছি এসে প্রত্যেকের বাড়িতে আগমনবার্তা দিয়ে লোক পাঠান। পরিবারের লোকজন তাদের অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সকলের জন্য উন্নত মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। তিনদিনব্যাপী আপ্যায়ন চলতে থাকে। আপ্যায়ন শেষে প্রত্যেককে একজোড়া করে কাপড় হাদিয়া দেন।

সবশেষে ওই সিন্দুকটি খোলেন এবং যার যার খাম নিয়ে যেতে বলেন। এভাবেই তিনি অকাতরে দানের এক বিরল নজির স্থাপন করেন দুনিয়ার বুকে।[২]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৭

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৮৫; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৮

■ আগের বারের মতো এবারও কাফেলা নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এবার সঙ্গো কয়েকটি পাখি নেওয়া হলো। যাত্রাপথে একটি পাখি মারা গেলে সেটা নর্দমায় ফেলে দিয়ে সহযাত্রীরা সামনে এগিয়ে চলল। সফরের নিয়ম অনুযায়ী ইবনুল মুবারক ছিলেন সবার পেছনে। নর্দমা পার হবার সময় খেয়াল করলেন, 'একটি কিশোরী মেয়ে সেই মরা পাখিটা তুলে নিয়ে একদৌড়ে চলে গেল পাশের ঝুপড়িতে। কৌতূহলবশত তিনি মেয়েটির কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'তুমি এটা তুলে আনলে কেন? কী করবে এটা দিয়ে?' মেয়েটি তখন বলতে লাগল, 'আমার বাবা নেই। তার মৃত্যুর পর আমাদের সব অর্থসম্পত্তি তার শত্রুরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে! তাই আমি আর আমার ছোট ভাই রাস্তা থেকে খাবার কুড়িয়ে এনে খাই। কখনো কখনো রাস্তার খাবারও জোটে না আমাদের কপালে। তখন নর্দমা থেকে মরা জীবজন্তু তুলে আনতে হয়। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে শরিয়ত আমাদেরকে মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।'

অসহায় মেয়েটির এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য শুনে ইবনুল মুবারকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় তার চোখ দুটি। তিনি কাফেলার এক সাথিভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের সাথে কত আছে এখন?'

লোকটি উত্তর দেয়, 'এক হাজার দিনার।'

তিনি বলেন, 'আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার খরচ বাবদ ২০ দিনার রেখে বাকিটা ওকে দিয়ে দাও। এই সাদাকা আমাদের এবারের হজের চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণকর হবে ইন শা আল্লাহ।'

এ কথা বলে তিনি সাথিদের নিয়ে মার্ভ শহরে ফিরে আসেন।[১]

■ একবার এক লোক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে এসে করজোড়ে মিনতি জানাল, 'জনাব, আমি একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ। ঋণের বোঝা আর সইতে পারছি না। দয়া করে আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন।' লোকটির করুণ অবস্থা দেখে ইবনুল মুবারকের দয়ালু মন আরও বেশি দয়ার্দ্র হয়ে উঠল। তিনি একটি পত্র পাঠালেন তার ব্যক্তিগত কোষাধ্যক্ষের কাছে। পত্রটি হাতে পেয়ে সে ঋণগ্রস্ত লোকটির কাছে জানতে চাইল, 'আপনার ঋণের পরিমাণ কত?'

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৮

লোকটি উত্তর দিলো, 'সাতশো দিরহাম।'

উত্তর শুনে তো কোষাধ্যক্ষ যারপরনাই অবাক! সঙ্গে সঙ্গে ইবনুল মুবারকের কাছে পাঠিয়ে দিলো ফিরতি এক চিঠি—'লোকটার ঋণের পরিমাণ মাত্র সাতশো দিরহাম। অথচ আপনি সাত হাজার দিরহাম দিতে বলেছেন! এভাবে চলতে থাকলে তো দুদিনেই আপনার সব অর্থসম্পদ শেষ হয়ে যাবে!'

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জবাবে লিখে পাঠান—'শুধু সম্পদ নয়; জীবনটাও একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন এই শেষ হয়ে যাওয়া সম্পদই কাজে আসবে। যেটা দিতে বলেছি সেটাই দিয়ে দিন তাকে।'[১]

■ একবার এক দুস্থ ব্যক্তি সাহায্য চাইতে এলে ইবনুল মুবারক তার খাদেমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তাকে এক দিরহাম দিয়ে দাও।' তখন তার এক ছাত্র বলে ওঠে, 'শাইখ, এই লোকটা মিষ্টি আর কাবাব খেয়ে অভ্যস্ত! তাকে পুরো এক দিরহাম দেওয়ার কী দরকার? সিকি দিরহাম দিলেই তো চলত!

উত্তরে তিনি বলেন, 'ওয়াল্লাহি, আমি ভেবেছিলাম, সে রুটি আর সবজি খায়। তাই এক দিরহাম দিতে বলেছি। যদি জানতাম, সে এর চেয়ে উন্নত খাবার খেয়ে অভ্যস্ত, তাহলে প্রথমেই আরও বেশি দিতে বলতাম।' এটা বলেই তিনি খাদেমকে ডেকে বলেন, 'লোকটাকে ১০ দিরহাম দিয়ে দাও!'[২]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৯

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৮

জিহাদের ময়দানে

মহামহিম আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ... ﴿١١١﴾

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন।[১]

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা মূলত এ কথার ঘোষণা দিই যে, আমাদের জানমাল কেবলই সুমহান রবের জন্য নিবেদিত। তিনি ছাড়া আর কারও সামনে আমরা মাথা নত করব না। তিনি ছাড়া আর কাউকে ভয় পাব না এবং তাঁর ভালোবাসার সাথে কখনো কিছুর তুলনা করব না। আর এই ঘোষণা তখনই বাস্তবিক হয়ে ওঠে, যখন কেউ দ্বীনের পথে পরিশ্রম ও সংগ্রাম করতে শুরু করে; নিজের জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার চেতনায় সদা উজ্জীবিত থাকে।

ওপরের আয়াতের শেষাংশে এই তাৎপর্যের প্রতিই আলোকপাত করে বলা হয়েছে—

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১১১

» তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর হত্যা করে কিংবা নিহত হয়। এ যুদ্ধের বিনিময়ে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জিলে ও কুরআনে। আর অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ থেকে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয় উপলক্ষ্যে—যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটাই মহাসাফল্য।[১]

তাছাড়া দ্বীনের পথে জিহাদকে মহান আল্লাহ মুমিনদের অন্যতম লাভজনক ব্যবসা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٢

» হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।[২]

তবে যে-কেউ চাইলেই এই জিহাদ করতে পারে না। জিহাদ করতে হলে প্রকৃত মুমিন হতে হয়। ঈমানের স্বাদ পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে হয় এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হতে হয়। কুরআনের ভাষায়—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝١٥

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১১১

[২] সুরা আস-সাফ, আয়াত : ১০-১২

» মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পর তাতে সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[১]

আল্লাহর পথে জিহাদের আদেশ পাওয়ার পর যদি মুমিনরা পার্থিব জীবন, পরিবার-পরিজন ও অর্থসম্পদের মোহে ঘরে বসে থাকে কিংবা কুফর ও শয়তানি শক্তির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের ওপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি নেমে আসবে। কাফিরদের হাতে তারা আমরণ নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন—

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

» যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন, তোমরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।[২]

উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন, উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতিতে মুমিনরা আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকলে, তিনি তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি করবেন এবং তাদের সরিয়ে অন্য কোনো জাতিকে বসাবেন। এই ঘোষণার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে, জিহাদের প্রতি অনীহার কারণে আজ তারা সর্বত্র নির্যাতিত ও নিগৃহীত।

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নীতি ও অবস্থান সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর মাধ্যমেই হয়তো আমরা ফিরে পাব জিহাদি চেতনা। আবারও দেখতে পাব মুসলিমদের বিজয় ও সাফল্য।

---

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৫

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩৯

মহান মুজাহিদ

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ইলম ও জ্ঞানের মাপকাঠিতে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম; যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতায় মহান সাধক এবং জিহাদের ময়দানে বীর মুজাহিদ। মহান আল্লাহ খুব কম মানুষকেই এমন বৈচিত্র্যময় গুণাবলি দান করে থাকেন। তিনি মসজিদের মিম্বারে খতিবের দায়িত্ব পালন করতেন। জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিতেন। ইলমের অঙ্গনে সুরভি ছড়াতেন। তিনি এক হাতে কলম; অন্য হাতে তলোয়ার চালাতেন। তার কলম ও তরবারি থেকে সমান হারে ঝরে পড়ত কালি ও রক্ত। তার ঢাল-তলোয়ারের ঝংকার এবং কাগজ-কলমের খসখস শব্দ সারা পৃথিবীর বুকে ঝড় তুলে দিত। তিনি কলমের আঁচড়ে এবং তলোয়ারের আঘাতে কাঁপিয়ে তুলতেন শত্রুশিবির। তার জীবনচরিত ও স্বরচিত *কিতাবুল জিহাদ* অধ্যয়ন করলে যে-কারও কাছে বিষয়টি সম্যকরূপে ধরা পড়বে। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার সম্বন্ধে বলেন, ‘ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মুজাহিদদের অহংকার।’[১]

আল-ইবার গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, ‘তিনি ছিলেন সাহস ও বীরত্বের মূর্তপ্রতীক—এক বছর হজ করতেন; আরেক বছর জিহাদ করতেন। মুসলিম দেশগুলোর সীমান্ত পাহারা দিতেন।’[২]

তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল কিতাবের গ্রন্থকার বলেন, ‘কখনো তারাসুস[৩] কখনো মাসসিসা[৪], আবার কখনো আন্তাকিয়া[৫], হলব[৬] ও রোমের পথে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতেন ইবনুল মুবারক। সুযোগ পেলেই মুসলিম দেশগুলোর আশঙ্কা-কবলিত সীমান্ত পাহারা দিতেন। আমৃত্যু নিজেকে এই মহান কাজে নিয়োজিত রেখেছেন তিনি। সীমান্ত থেকে ফেরার পথেই পাড়ি দিয়েছেন না-ফেরার দেশে। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রসঙ্গত, যুদ্ধে

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৩

[২] *আল-ইবার,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮১

[৩] শামের অন্তর্গত একটি শহর।

[৪] এটি তারাসুসের নিকটে শামের অন্তর্গত একটি শহর। রোম সীমান্তে এর অবস্থান।

[৫] তুরস্কের হাতায়া প্রদেশের রাজধানী।

[৬] সিরিয়ার একটি অঞ্চল।

অবস্থানকালেও তিনি ইলমচর্চা থেকে বিরত থাকতেন না। হাদিস শোনাতেন সবাইকে। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতেন এবং হাতে-কলমে অস্ত্রচালনা শেখাতেন।'[১]

যাইলুল যাওয়াহিরুল মুযিয়াহ বইটির লেখক বলেন, 'তিনি যুদ্ধ করতেন বীরদর্পে। কিন্তু গনিমত কিংবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় হলে তাকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যেত না, কোথায় যেন হারিয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আমি যাঁর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করছি, তিনি আমায় খুব ভালো করে চেনেন। আমি চাই, পুরস্কারটা তিনি নিজ হাতে আমাকে দেবেন।'[২]

তিনি লোকদের বোঝাতেন যে, 'তরবারির ছায়ায় ইবাদত করা মসজিদের মিহরাবে ইবাদত করার চেয়ে বহুগুণ উত্তম।' বিখ্যাত জ্ঞানতাপস ফুযাইল ইবনু ইয়াযের কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাফিয ইবনু আসাকির *আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর জীবনীতে* উল্লেখ করেন—১৭৭ হিজরিতে জিহাদের উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী তারাসুস শহরে গমন করেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম ইবনি আবি সুকায়নাকে সাত লাইনের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এরপর কবিতাটি লিখে মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিমের মাধ্যমে পবিত্র কাবায় ইবাদতরত ফুযাইল ইবনু ইয়াযের নিকট পাঠিয়ে দেন। কবিতার ভাষ্য ছিল এমন—

হারামাইনে[৩] বসে তো বেজায় ইবাদত করছ!
আমাদের দেখলে তোমার কী মনে হবে, জানো?
তুমি ইবাদত নয়, স্রেফ খেল-তামাশায় ব্যস্ত।
তোমার কপোল যখন অশ্রুজলে সিক্ত,
আমাদের বক্ষদেশ তখন তাজা রক্তে রঞ্জিত।
তুমি কল্পরাজ্যে চিন্তার ঘোড়া ক্লান্ত করে বসো,
আমাদের ঘোড়া যুদ্ধপ্রান্তরে দিনশেষে পরিশ্রান্ত।

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৭৮

[২] *যাইলুল যাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৩৪

[৩] মক্কা-মদিনায়

মিশকের সুবাস তো কেবল তোমাদেরই জন্য;
জিহাদের রৌদ্রপ্রখর ময়দানে আমাদের সাথি—
রক্তভেজা ঘোড়া আর পূতিগন্ধময় বালুরাশি।
নবিজির এমন বাণীর সন্ধান আমরা পেয়েছি,
যা চিরন্তন সত্য; যেখানে মিথ্যের ছিটেফোঁটা নেই।
রবের পথে অশ্বখুরের ধূলি আর জাহান্নামের অগ্নিধোঁয়া
মুজাহিদের নাকে রবে না কভু একসাথে।
কুরআনের আয়াত সদা সত্য কথাই বলে—
আল্লাহর জন্য যারা শহিদ হয়েছে, তারা মৃত নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম বলেন, 'আমি চিঠি-সহ মাসজিদুল হারামে পৌঁছে ফুযাইল ইবনু ইয়াযের সাথে দেখা করি। পত্রটি পড়েই তিনি অবিরল ধারায় কাঁদতে শুরু করেন। দীর্ঘ সময় কাঁদার পর তিনি বলে ওঠেন, আবু আব্দির রহমান যথার্থ বলেছেন; আমাকে সদুপদেশ দিয়েছেন। এরপর ফুযাইল আমাকে লক্ষ্য করে বলেন—

'তুমি কি হাদিস লেখো?'

'জি, লিখি।'

'তাহলে এই হাদিসটি লিখে নাও : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—

❝

أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِيْ عَمَلاً أَنَالُ بِهِ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا تَفْتُرُ وَتَصُوْمُ فَلَا تُفْطِرُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا أَضْعُفُ مِنْ أَنْ أَسْتَطِيْعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ طَوَّقْتَ ذَلِكَ مَا بَلَغْتَ فَضْلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِيْ طُوْلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٌ.

জনৈক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সাওয়াব পাব। আল্লাহর রাসুল তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অক্লান্তভাবে সারাদিন সালাত আদায় করতে পারবে?

দিনের পর দিন সিয়াম রাখতে পারবে? লোকটি বলে, হে আল্লাহর রাসুল! আমি নিতান্ত দুর্বল। আমার পক্ষে এমন আমল করা সম্ভব নয়। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ওই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যদি এমন করতেও পারো, তবুও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মর্যাদা ও ফজিলত পাবে না। তোমার কি জানা আছে যে, মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় যতবার নড়াচড়া করে, ততবারই মুজাহিদের জন্য একটি করে সাওয়াব লেখা হয়?[১]

পৃথিবীজুড়ে নিপীড়িত মুসলিম রমণীদের সাহায্যের জন্য তার চেতনা যেভাবে জ্বলে উঠত এবং শিরা-ধমনীতে যে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ত, তার পরিচয় পাওয়া যায় নিচের পঙ্‌ক্তিগুলোতে—

كيف القرار وكيف يهدى مسلم   والمسلمات مع العدو المعتدى

الضاربات خدودهن برنة   الداعيات نبيّهن محمد

القائلات إذا خشين فضيحة   جهة المقالة ليتنا لم نولد

ما تستطيع وما لها من حيلة   إلا التستر من أخيها باليد

পুরুষ, তুমি কীভাবে স্থির বসে থাকো?
হাজারো মুসলিম বোন আজ শত্রুর কবলে বন্দি!
কাতর হয়ে তারা গাল চাপড়ে কাঁদে
আর করুণ সুরে ডাকে ভালোবাসার প্রিয় নবিকে।
সম্ভ্রম বিনষ্টের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে বলে,
হায়, যদি জন্মই না হতো ধরণির বুকে!
তারা অসহায়, তারা নিপীড়িত।
শত্রুর সমুখে হাতে মুখ লুকোনো ছাড়া
তাদের কী-ই বা করার আছে![২]

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩২৮; *যাইলুল যাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৩৩; *তারিখু দিমাশক*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[২] *কিতাবুল জিহাদ*, পৃষ্ঠা : ২০

বীরত্বগাথা

আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আর মুতামির ইবনু সুলাইমানের সাথে তারাসুসে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বহু মানুষের শোরগোল শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কাফির ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক-সহ আরও কিছু সৈন্য বেরিয়ে পড়েছেন। শত্রুপক্ষ দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ হয়ে। উভয় দল মুখোমুখি এখন। যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী প্রথমে এক রোমান সৈন্য বেরিয়ে আসে। মুসলিমদেরকে সে মল্লযুদ্ধের আহ্বান করে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরেক মুসলিম সৈনিক এগিয়ে যায় তার দিকে। শত্রুপক্ষের কাফির সৈন্যটি বেশ শক্তিশালী। মুসলিম সৈন্যকে ধরাশায়ী করে ফেলে মুহূর্তের মাঝে। এভাবে একের পর এক ছয়জনের প্রাণ কেড়ে নেয়। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার অহমিকাবোধ। যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করা দু-আঙুলের ব্যাপার! দুই সারির মাঝে দাঁড়িয়ে সে চক্কর মারে আর মুসলিমদেরকে যুদ্ধের আহ্বান করে। তাকে দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় মুসলিম সৈন্যরা। তার সাথে লড়াই করার সাহস হারিয়ে ফেলে।

ঠিক তখনই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, প্রিয় ভাই, আমি যদি শহিদ হয়ে যাই, তাহলে আমার অমুক অমুক কাজ করে দিয়ো। এরপর তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যান। শুরু হয় কাফির সৈন্যের সাথে তুমুল যুদ্ধ। হঠাৎ ইবনুল মুবারক তাকে ভূপাতিত করে চোখের পলকে হত্যা করে ফেলেন। পরবর্তী মল্লযুদ্ধের জন্য কাফিরদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। এভাবে তিনি একে একে বধ করেন ছয়-ছয়জন কাফিরকে।

এরপরও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতেই থাকেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তবে কেউই আর লড়াই করার সাহস পায় না তার সাথে। সবার মাঝেই ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আমরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কাফিরদের মাঝে হারিয়ে যান।'

পরবর্তী সময়ে তার সাথে আমার দেখা হলে আমাকে বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমি জীবিত থাকতে এই ঘটনা যদি কাউকে বলো...' এতটুকু বলেই তিনি থেমে গেলেন। (তার বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তিনি চান না তার জীবদ্দশায় কেউ এই ঘটনা জেনে যাক। কারণ, ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে মানুষ

তার প্রশংসা করত, তাকে 'বীর' উপাধিতে ভূষিত করত। তাই এই ঘটনার কথা কাউকে জানাতে পরোক্ষভাবে বারণ করে দিলেন আমায়।)'[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪০৮-৪০৯

ইলমের প্রচার ও দাওয়াহ

মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন নিবেদিত মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কী হতে পারে?[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলেও পৌঁছে দাও।[২]

এ ধরনের বেশ কিছু নস[৩] সামনে থাকায়, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ আত্মোন্নয়ন, দান-সাদাকা এবং দাওয়াত ও জিহাদের মতো ইলমের প্রচার-প্রসারেও

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৩

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৬১

[৩]কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুস্পষ্ট দলিলকে নস বলা হয়।

ছিলেন সমকালীন মানুষগুলো মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। এক্ষেত্রেও তার অবদান ছিল অপরিসীম। তবে সবখানেই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করতেন। যশ-খ্যাতিকে হিংস্র প্রাণীর চেয়েও বেশি ভয় করতেন তিনি।

ইলমের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত এই মহান মনীষীকে একবার প্রশ্ন করা হয়, 'প্রকৃত মানুষ কারা?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'ওই সকল আলিম, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন এবং সকল ক্ষেত্রে ইখলাস ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন।'[১]

তিনি বলতেন, 'ইলমের জন্য প্রথম হলো নিয়ত, তারপর শ্রবণ, এভাবে পর্যায়ক্রমে অনুধাবন, শিক্ষাগ্রহণ, মুখস্থকরণ এবং সবশেষে ইলমের প্রসার।'[২]

মার্ভ শহরে তার বাড়ির আঙিনাটি ছিল বেশ বড়। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ গজ। মারওয়ের অসংখ্য জ্ঞানীগুণী এবং আবিদ-যাহিদ সেখানে নিয়মিত আসত। তারা ইলমচর্চা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাদের মাঝে উপস্থিত হলে সকলের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন।[৩]

তিনি ইলম শেখার জন্য যেমন দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি মানুষের নিকট ইলম পৌঁছে দেওয়ার জন্যও দূরদূরান্তে সফর করেছেন। বাগদাদ শহরে গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। হাদিসের দারস দিয়েছেন সেখানকার লোকদের।[৪] মক্কায় গিয়ে সেখানকার আলিমগণকে হাদিস শুনিয়েছেন। এক কথায় তিনি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।[৫]

যে ব্যক্তি ইখলাস ও একমাত্র আল্লাহর জন্য ইলম অর্জন করে না, তাকে কখনো হাদিস শোনাতেন না তিনি। যদি কারও ব্যাপারে জানতে পারতেন যে, সে সুনাম-সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করছে, তবে শত অনুরোধ সত্ত্বেও

---

[১] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ১৪

[২] *আদ্দিবাজুল মুযাহহাব*, ইবনু ফারহুন

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১০৯

[৪] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৩

[৫] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬২

তাকে হাদিস শেখাতেন না।

তিনি ইলমের পরিপূর্ণ হক আদায় করতেন। ছাত্রদের পেছনে দেদারসে অর্থ ব্যয় করতেন যাতে তারা সঠিকভাবে ইলম অর্জন করে তা প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। তিনি বলতেন, নবুওয়াতের পর ইলমের প্রচার ও প্রসারের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ আছে বলে আমার জানা নেই।[১]

একবার এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু আব্দির রহমান, প্রতিদিনের বেঁচে যাওয়া সময়টুকু আমি কোন কাজে ব্যয় করব? কুরআন শিক্ষার কাজে? নাকি ইলম অর্জনের কাজে?'

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যতটুকু কুরআন জানো, তা দিয়ে কি সালাত আদায় করতে পারো?'

সে বলল, 'জি, পারি।'

তখন তিনি বললেন, 'তাহলে অবশিষ্ট সময়টুকু তুমি ইলম অর্জনের কাজে ব্যয় করো। কারণ, এর ফলে তোমার কুরআন বুঝতে সহজ হবে।'[২]

আব্দুল্লাহ আল-খুরাসানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার কনকনে এক শীতের সকালে আমি ও আমার এক বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দরজায় কড়া নাড়ি। তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন জায়গা থেকে এসেছ? আমরা জায়গার নাম বললে তিনি আমাদের ভেতরে নিয়ে যান এবং ঠিক ততক্ষণ সময় দেন, বাড়ি থেকে তার কাছে আসতে আমাদের যতক্ষণ সময় লেগেছিল। তার এই দীর্ঘ সময় দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য—এখানে আসতে আমাদের যতটা কষ্ট পোহাতে হয়েছে, ততটা বিশ্রামের মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দেওয়া।'[৩]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬০

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[৩] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৮

ইলমের সাগরে তিনি এতটাই ডুবে থাকতেন যে, মনে হতো এটাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও চেষ্টা-সাধনা। ব্যাপারটা সহজে বুঝতে নিচের উদাহরণটাই যথেষ্ট। আলি ইবনুল হাসান ইবনি শাকিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন শীতের রাতে আমি আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইশার সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। দরজায় এসে তিনি একটি হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করলেন। আমিও নিবিষ্ট মনে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। সময় বয়ে চলল। রাত গড়িয়ে সুবহে সাদিক হয়ে গেল। মুআযযিন আযান দিতে এলো মসজিদে। আমরা দুজন তখনো দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে...।'[১]

ইলমের আদব ও সম্মান রক্ষায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস বিশর ইবনুল হারিস আল-হাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার চলার পথে এক লোক তার কাছে একটি হাদিসের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা ইলমের আদবের পরিপন্থি। বিশর বলেন, তার এই উত্তরটি আমার ভীষণ পছন্দ হয়।'[২]

বিনয়

মহামহিম আল্লাহ বলেন—

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না।[৩]

কুরআনের এই নির্দেশনা মেনে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ সর্ববিষয়ে নিজেকে অন্যদের চেয়ে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। ব্যক্তিগত অর্থসম্পদের কোনো মূল্য ছিল না তার কাছে। গরিবদেরও তিনি সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, 'বিনয়ের মূলকথা হচ্ছে, তুমি তোমার চেয়ে নিম্নবিত্তদের সামনে নিজেকে তুচ্ছ ভাববে যেন অর্থসম্পদের কারণে তাদের ওপর তোমার কোনো ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৩] সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬

ভাব চলে না আসে। অপরদিকে তোমার চেয়ে উচ্চবিত্তদের সামনে নিজেকে মর্যাদাবান ভাববে যেন সম্পদের অজুহাতে তোমার ওপর তাদের কোনোরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ না পায়।'[১]

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'অহংকার কী?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।'[২]

আরেকবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আত্মম্ভরিতা কী?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমার কাছে এমন কিছু আছে, যা অন্যদের কাছে নেই—এই ধারণা পোষণ করা।'[৩]

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার কোনো একটা কাজে কুফায় গিয়েছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে শিক্ষার্থীরা *কিতাবুল মানাসিক* পড়ছিল। একপর্যায়ে এমন একটি হাদিস সামনে আসে যার শেষে লেখা ছিল—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'এটাই আমাদের মত।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জিজ্ঞেস করেন, আমার কথা কে লিখেছে এখানে? আমি উত্তরে বলি, যার বই সে-ই লিখেছে। আমার এ কথা শুনে তিনি পাঠদান শেষ হওয়া পর্যন্ত তার হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে সেই লেখাটুকু তুলতে থাকেন। একই সাথে পাঠদানও চালিয়ে যান। এরপর বলেন, আমি এমন কেউ নই যার কথা বইতে লিখতে হবে।[৪]

হাসান রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'একদিন আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে একটি কূপের সামনে নিয়ে আসেন। মানুষজন সেখান থেকে পানি উঠিয়ে পান করছিল। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকও পানি পান করার জন্য কূপের কাছে যান। কিন্তু লোকেরা তাকে চিনতে না পারায় তার সাথেও ধাক্কাধাক্কি করে।

---

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩৪২

[২] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৬

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪০৬, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৩৫

তারপর তিনি ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বলেন, এটাই জীবন। অর্থাৎ, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, সেখানে আমাদের কেউ সম্মানও করবে না।'[১]

একবার মাসজিদুল হারামে তাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার মতো মানুষ মাসজিদুল হারামে বসে ফাতওয়া দেবে! আমার মতো মানুষ মাসজিদুল হারামে বসে ফাতওয়া দেবে! আমার মতো মানুষ মাসজিদুল হারামে বসে ফাতওয়া দেবে!'[২]

এক ব্যক্তি ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর জন্য এই বলে দুআ করেন, 'আল্লাহ আপনাকে তা-ই দান করুন যা আপনি প্রত্যাশা করেন।'

প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'প্রত্যাশা কেবল তখনই করা যায়, যখন আল্লাহর পরিচয় পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। আমি তো এখনো তাঁর পরিচয় পাইনি।'[৩]

বিখ্যাত সাধক মালিক ইবনু দিনারের একটি বাণী তার ভীষণ পছন্দ। বাণীটি হলো—'যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটি যেন মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে সবার আগে আমিই দরজার দিকে এগিয়ে যাব। শারীরিক শৌর্যবীর্য কিংবা দৌড়ে দক্ষতা ছাড়া কেউ আমার আগে বাড়তে পারবে না।' ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ যেদিন প্রথম এই কথাটি শুনেছিলেন, সেদিন মন্তব্য করেছিলেন, 'এই উন্নত চেতনা ও মানসিকতার জন্যই তিনি আজকের মালিক ইবনু দিনারে পরিণত হয়েছেন!'[৪]

বিনয়ের আতিশয্যে তিনি নিজের জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করাকেও দুঃসাহসী কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলেন, 'গতকাল রাতে আমি একটি দুঃসাহসী কাজ করে ফেলেছি—আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করে ফেলেছি।'[৫]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৩

[৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩৪৩

[৪] *প্রাগুক্ত*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩৪২

[৫] *প্রাগুক্ত*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৮৫

তার এই বিনয় এজন্য ছিল না যে, মানুষ তাকে বিনয়ী ভাববে; বরং বাস্তবিক অর্থেই তিনি নিজেকে মহান প্রভুর অতি নগণ্য গোলাম মনে করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাকে বলেছিল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো; আত্মপরিচয় খুঁজে বের করো।[১] কেননা বান্দা তার আসল পরিচয় জানতে পারলে কখনোই তার রবের অবাধ্য হতে পারে না; দম্ভভরে চলতে পারে না এবং মানুষকে কষ্ট দিতে পারে না। মোটকথা, আল্লাহর বিধানের বাইরে কোনো কাজই সে করতে পারে না।'

নিভৃতচারী এক শাইখ!

মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রায়ই রাক্কা[২] শহরে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানকার এক মুসাফিরখানায় উঠতেন তিনি। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এক যুবক সেখানে নিয়মিত আসত এবং যথারীতি ইবনুল মুবারকের কাছ থেকে হাদিস শুনত।' মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা বলেন, 'একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাক্কা শহরে গিয়ে সেই যুবকের দেখা পেলেন না। সেবার তার তাড়া ছিল বলে যুবকের খোঁজ নিতে পারেননি। জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়েন সৈন্যদলের সাথে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ইবনুল মুবারক আবার রাক্কায় চলে গেলেন। সেই যুবকটির ব্যাপারে স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানাল, 'যুবকটি একজনের কাছ থেকে ১০ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিল। ধার শোধ করতে পারেনি বলে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।' এ কথা শুনে সোজা ঋণদাতার বাড়ি চলে গেলেন ইবনুল মুবারক। গুনে গুনে পুরো ১০ হাজার দিরহাম তুলে দেন তার হাতে। আর অনুরোধ করেন, 'কথা দাও ভাই, আমি (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক) যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তুমি এই ঋণশোধের কথা কাউকে বলবে না। আর সকাল হলেই যুবকটিকে ছেড়ে দিয়ো।'

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সফরে বেরিয়ে যান। ওদিকে যুবক মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে মুসাফিরখানায়। জানতে পারে, শাইখ কাল রাতে এখানেই ছিলেন। কিন্তু কোথায় গেছেন তা বলে যাননি। যুবকটির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন অনেকের কাছে।

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৮০

[২] ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সিরিয়ার একটি শহর।

যুবকটি ইবনুল মুবারকের বাহনের পদচিহ্ন দেখে দেখে সামনে এগুতে থাকে। রাক্কা থেকে দুই কি তিন মনজিল[১] দূরে গিয়ে সে তার দেখা পেয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—

'আরে, কোথায় ছিলে এতদিন? কত খুঁজলাম তোমাকে! কোথাও পেলাম না।'

'জি শাইখ, ঋণের কারণে আমি বন্দি ছিলাম।'

'মুক্তি পেলে কী করে?'

'কেউ একজন আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। অথচ তার নামটাও আমি জানি না।'

'শোনো, তুমি বরং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করো। তিনিই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

যতদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জীবিত ছিলেন, ততদিন সেই ঋণদাতা তার কথা কাউকে বলেননি।[২]

আত্মসম্মানবোধ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির হলেও যথেষ্ট আত্মমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি শাসকশ্রেণি ও দুনিয়াপ্রেমীদের দাওয়াত ও উপঢৌকন সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতেন। তাদের সামনে নিজেকে হীনভাবে উপস্থাপন কিংবা তাদের কৃপা ও সুদৃষ্টি লাভের প্রচেষ্টা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। ইলমের মর্যাদার সামনে তাদের সিংহাসনের কোনো মূল্যই ছিল না তার কাছে। মীর শরীফ জুরজানি অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন, 'আলিমরা যদি ইলমের মর্যাদা রক্ষা করত, ইলমও তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখত। যদি তারা মানুষের অন্তরে ইলমের প্রতি সম্মান সৃষ্টি করতে পারত, ইলমও তাদের সম্মানিত করত। কিন্তু তারা তো ইলমকে লাঞ্ছিত করেছে, ফলে নিজেরাও হয়েছে লাঞ্ছিত। লোভ-লালসায় পড়ে ইলমকে করেছে কলুষিত; পরিণাম—নিরবে নিভৃতে ইলমের প্রস্থান!'

---

[১] এক মনজিল সমান ১৬ মাইল।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৪১-১৪২

শাসকদের অনুদান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ করাকে তিনি নিজের জন্য অবমাননাকর ও অপমানজনক মনে করতেন। হাসান ইবনুর রাবি' বলেন, 'একবার আমরা নৌপথে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর সাথে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো। তিনি আমাদের বললেন, আমার ছাতু খেতে খুব ইচ্ছে করছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছাড়া আর কারও কাছেই ছাতু নেই! আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিলেন সেটা। স্রেফ রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে দূরে থাকার জন্য মৃত্যুর আগে তিনি তার শেষ ইচ্ছেটাও পূরণ করলেন না!'[১]

আবু আলি আর-রূযবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারে সমকালীন চারজন মনীষীর চার ধরনের রীতি বা অবস্থা লক্ষ করা যায়—

এক. ইউসুফ ইবনু আসবাত্ব রাহিমাহুল্লাহ। তিনি কখনোই শাহি উপঢৌকন কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপহার নিতেন না।

দুই. আবু ইসহাক আল-ফাযারি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি শাহি উপঢৌকন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপহার—দুটোই নিতেন।

তিন. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ। তিনি শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপহার গ্রহণ করতেন; কিন্তু শাহি উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।

চার. মুখাল্লাদ ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ। তিনি শাহি উপঢৌকন গ্রহণ করতেন; কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপহার গ্রহণ করতেন না।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক পরিচিত কারও ব্যাপারে যখন জানতেন যে, তিনি শাহি উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন, তখন তাকে সম্পূর্ণ উপঢৌকন সাদাকা করে দেওয়ার উপদেশ দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি আলিম-জাহিল এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়—কারও মাঝেই কোনো পার্থক্য করতেন না।

আহমাদ ইবনু জামিল আল-মারযুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, ইসমাইল ইবনু উলাইয়া রাষ্ট্রীয় যাকাত-সাদাকা উসুল করার দায়িত্ব পেয়েছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪১১; *যাইলুল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫২৯

[২] *মুজামুল উদাবা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২১৪

কাছে লিখে পাঠালেন—'তুমি তো গরিবের সম্পদ মেরে খাওয়ার জন্য তোমার জ্ঞানকে আজ বাজপাখি বানিয়েছ; কৌশলে দ্বীন বেচে দুনিয়া ও তার স্বাদগ্রহণকে হালাল করে নিয়েছ। একসময় তুমি দুনিয়াদার পাগলদের ডাক্তার ছিলে। এখন তুমি নিজেই পাগল বনে গেছ! তুমি কি আজ ভুলে গেছ, ইবনু সিরিন আর ইবনু আউনের কথা? তুমি কি ভুলে গেছ, দরবারি লোকদের ব্যাপারে তোমার সতর্কতা ও সতর্কবাণী? যদি তুমি বলো, না, আমি এসব কিছুই ভুলিনি; বরং আমাকে বাধ্য করা হয়েছে, তবে আমি বলব, এটা কিছুতেই মেনে নেবার নয়! বরং জ্ঞানবাহী গাধাটা আজ মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

ইসমাইল ইবনু উলাইয়া এই চিঠি পড়ে বেশ অনুতপ্ত হন। কাঁদতে শুরু করেন এবং দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।'[১]

একবার খলিফা হারুনুর রশিদ আবু ইসহাক আল-ফাযারিকে তিন হাজার দিনার হাদিয়া দেন। ঠিক তখনই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার সাথে দেখা করতে আসেন। দিনারের ছড়াছড়ি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এগুলো আপনি কোথায় পেয়েছেন?'

উত্তরে আবু ইসহাক বলেন, 'আমি নিতে চাইনি; তবুও আমিরুল মুমিনিন একপ্রকার জোর করেই আমাকে এগুলো দিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'আপনি যদি মনে করেন এগুলোর প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ রয়েছে, তবে এক্ষুনি এসব সাদাকা করে দিন।'

জনশ্রুতি আছে যে, আবু ইসহাক তখনই বাজারে চলে যান এবং সাদাকা শেষ করে তবেই তিনি বাড়ি ফেরেন।[২]

শাসকশ্রেণির ক্ষেত্রে ইবনুল মুবারক তার উস্তায সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহর উপদেশ মেনে চলতেন। তিনি বলেন, 'আমার উস্তায এক চিঠিতে আমাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন—আল্লাহ তোমাকে যে ইলম দিয়েছেন তা মানুষের কাছে প্রচার করবে এবং নিজেকে সবসময় শাসকদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখবে।'[৩]

---

[১] *তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৪৯

[২] *মুজামুল উদাবা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২১৫

[৩] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৩

আমির-উমারাদের কেউ তার কাছে হাদিস শুনতে চাইলে তিনি শোনাতেন না। কারণ, তিনি জানতেন, তারা সাধারণত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শেখে না; বরং নেতৃত্বের যোগ্যতা ও আত্মমর্যাদা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইলম শেখে। একবার মার্ভ শহরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনু আবিল আব্বাস আত-তারাসুসি হাদিস শোনার জন্যে রাতের বেলা ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর বাড়িতে হাজির হন। সাথে করে দোয়াত, কাগজ ও একজন লিপিকারও নিয়ে আসেন। কিন্তু ইবনুল মুবারকের সাফ সাফ কথা, 'আমি রাষ্ট্রীয় লোকদের কাউকে হাদিস শোনাই না। তিন-তিনবার অনুরোধের পরও তিনি হাদিস শোনাননি। তখন বাধ্য হয়েই গভর্নর তার লেখককে কাগজ গুটিয়ে নিতে বলেন এবং আফসোস করে মন্তব্য করেন, 'আবু আব্দির রহমান আমাদেরকে হাদিস শেখার যোগ্য বলে মনে করেন না।'

এ কথা বলে গভর্নর বাইরে দাঁড় করানো বাহনের দিকে এগিয়ে যান। ইবনুল মুবারকও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকেন। তখন তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু আব্দির রহমান, আপনি তো আমাদের হাদিস শেখার অযোগ্য মনে করেন; তবুও কেন আমাদের সাথে হাঁটছেন?'

উত্তরে ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমি আপনার জন্য নিজেকে সঁপে দিতে পারি; কিন্তু হাদিসকে অসম্মান করতে পারি না।'[১]

চরিত্র ও ব্যবহার

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[২]

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে

---

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৯; *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[২] সুরা কলাম, আয়াত : ৪

বেশি ওজনের আর কোনো আমল থাকবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।'[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীলভাষী ও দুরাচারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।'[২]

উত্তম চরিত্রের দ্বারা একজন সাধারণ মানুষ অধিক পরিমাণে ইবাদতকারী ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে। কারণ, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে সাওম-পালনকারী ও তাহাজ্জুদ-আদায়কারীর সমমর্যাদা লাভ করতে পারে।'[৩]

আমাদের প্রিয় ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক যেহেতু কুরআন-হাদিস এবং নবি ও সাহাবা-চরিত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন, সেহেতু আমরা হলফ করেই বলতে পারি যে, তার মাঝে উত্তম চরিত্র ও সদাচারের গুণ সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কারণ, এ দুটি জ্ঞান ব্যতীত সাধারণ আলিম হওয়াও সম্ভব নয়; যুগের ইমাম হওয়া তো অনেক পরের কথা!

তাছাড়া তিনি উত্তম চরিত্র ও সদাচারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'সদাচার ও উত্তম চরিত্র হলো, মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা; উত্তম জিনিস দান করা এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।'[৪]

একবার তাকে বলা হয়, এক কথায় উত্তম ব্যবহারের পরিচয় দিন। উত্তরে তিনি বলেন, 'রাগ নিয়ন্ত্রণ।'[৫]

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ২০০২

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৫৫৯

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৯৮

[৪] *জামি তিরমিযি* : ২০০৫

[৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৬৬

উল্লেখ্য, রাগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি হাদিসেও বেশ জোরালোভাবে এসেছে—

“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ تَغْضَبْ ‏"‏‏.‏ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ ‏"‏ لاَ تَغْضَبْ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।’ তিনি বললেন, ‘তুমি রাগ করো না।’ লোকটি বার কয়েক একই অনুরোধ করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রতি বার একই উত্তর দিলেন। বললেন, ‘রাগ করো না। তুমি কখনো রাগ করো না।’[১]

মুসলিম ভাইয়ের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়াও অনেক বড় গুণ। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ যখন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন খতম করতেন, তখন মুমিন-মুসলিম, নারী-পুরুষ সকলের জন্য দুআ করতেন।[২] তিনি মানুষকে পারস্পরিক কল্যাণ কামনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন।

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘সব থেকে উত্তম আমল কোনটা?’ তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে সদুপদেশ দেওয়া এবং তার জন্য শুভকামনা করা।’[৩]

একদিন এক পাপাচারী ইবনুল মুবারকের সফরসঙ্গী হয়। মুখ বুজে তার সকল অন্যায় কাজ সহ্য করেন তিনি। বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে সুন্দর ও কোমল আচরণ করে যান। সফর শেষে তার থেকে বিদায় নেওয়ার পর তিনি কাঁদতে শুরু করেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, ‘লোকটার জন্য ভীষণ মায়া হচ্ছে। আমরা দুজন একসাথে সফর করেছি। কিন্তু তাকে সদাচার শেখানোর আগেই আমাদের সফর শেষ হয়ে গেল।’[৪]

---

[১] সহিহ বুখারি : ৬১১৬

[২] আত-তিবইয়ান : ৮৩

[৩] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা : ৭১

[৪] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৫২

তিনি বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের খুব ভালোবাসতেন; তাদের মূল্যায়ন করতেন এবং সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি তার ভাই ও সহকর্মীদের অবহেলা করে, সে প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব হারায়।'[১]

হাসান ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারককে বললাম, মাঝে মাঝে আমার এক প্রতিবেশী এসে আমার ক্রীতদাস সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে, সে এই এই অপরাধ করেছে। কিন্তু আমার ক্রীতদাস বরাবরই তার অভিযোগ অস্বীকার করে। তাছাড়া ওকে শাস্তি দিতেও ইচ্ছে করে না, কারণ হতে পারে সে নিরপরাধ। আবার একেবারে ছেড়ে দিতেও মন সায় দেয় না। কারণ, এতে অভিযোগকারী প্রতিবেশী মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে। এখন আপনিই বলুন আমি কী করব?'

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তুমি এক কাজ করো। আজ-কালকের মধ্যেই হয়তো তোমার ক্রীতদাসটি শাস্তিযোগ্য কোনো ভুল বা অপরাধ করবে। তুমি প্রতিবার ভুলের জন্য ছাড় দিলেও এবার দেবে না; বরং তা মনে রাখবে। এরপর তোমার প্রতিবেশী নালিশ নিয়ে এলে ক্রীতদাসকে পূর্বোক্ত অপরাধের শাস্তি দেবে। এতে প্রতিবেশীও সন্তুষ্ট হবে। ক্রীতদাসও নির্বিচারে শাস্তি পাবে না!'[২]

ইয়াহুদি প্রতিবেশী

তিনি শুধু শিক্ষক, ছাত্র কিংবা পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সাথেই কোমল আচরণ করতেন না; বরং অচেনা-অজানা লোকদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতেন। ভিন্নধর্মের অনুসারীরাও তার সদাচার থেকে বঞ্চিত হতো না। ইসলামি শরিয়তের নিরিখে তাদের সাথেও তিনি সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন। প্রতিবেশী বিধর্মী হলেও তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। তার খোঁজখবর নিতেন।

প্রসিদ্ধ আছে, তার এক ইয়াহুদি প্রতিবেশী ছিল। একবার সে তার বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। ক্রেতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কত টাকায়[৩] বিক্রি করতে চান? ইয়াহুদি বলে, দুই হাজার টাকায়। ক্রেতা বাড়িটা খুব ভালোভাবে দেখে বলে, এই বাড়ির দাম খুব বেশি হলে এক হাজার টাকা হবে।

---

[১] *তবাকাতুশ শারানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬০

[২] *মাকারিমুল আখলাক*, খারাইতি, পৃষ্ঠা : ৪০

[৩] এখানে 'টাকা' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত।

ইয়াহুদি বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন; এর দাম এক হাজারের বেশি হবে না। কিন্তু এর দাম দুই হাজার চাওয়ার কারণটা তো একটু শুনুন। এক হাজার বাড়ির মূল্য আর বাকি এক হাজার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের প্রতিবেশী হওয়ার মূল্য!

কথাটা ইবনুল মুবারকের কানে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহুদিকে ডেকে পাঠান। তার হাতে বাড়ির নগদ মূল্য তুলে দিয়ে বলেন, 'তুমি তোমার বাড়িটা বিক্রি করো না।'[১]

সততা ও স্বচ্ছতা

মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য নিয়ে যায় জান্নাতপানে। নিশ্চয় মানুষ যখন সর্বদা সততা অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হয়। আর মিথ্যা অবশ্যই পাপাচারের পথ দেখায় এবং পাপাচার মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হয়।[৩]

---

[১] আল কলাইদ মিন ফারাইদিল ফাওয়াইদ, পৃষ্ঠা : ১৩৩

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ১১৯

[৩] সহিহ বুখারি : ৬০৯৪

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলতেন, ‘সন্দেহযুক্ত এক দিরহাম বর্জন করা, আমার কাছে লক্ষ লক্ষ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে উত্তম।’[১] যেসব দানবীর অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে মসজিদ-মাদ্রাসায় অকাতরে দান করেন, ওপরের কথাটি তারা ভেবে দেখার সময় পাবেন কি?

তিনি আরও বলতেন, ‘হালাল সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে এক দিরহাম দান করা, আমার কাছে সন্দেহযুক্ত ষাট দিরহাম দান করার চেয়েও অধিক উত্তম।’[২]

তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তিনি কখনো একা একা খেতেন না। খাওয়ার সময় হলে খাদেম, প্রতিবেশী কিংবা কোনো পথচারীকে মেহমান বানাতেন। এরপর একসাথে খাবার খেতেন। খাওয়ার সময় তিনি তার উস্তায ইমাম আওযায়ি রাহিমাহুল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন। ইমাম আওযায়ি বলতেন, ‘তিন ব্যক্তির খাবারের হিসেব গ্রহণ করা হবে না—

» যে ব্যক্তি সাহরি খায়।

» যে ব্যক্তি সিয়াম শেষে ইফতার করে।

» যে ব্যক্তি মেহমানকে সাথে নিয়ে খায়।’[৩]

একবার এক লোক তাকে অনুরোধ করে বলেন, ‘শাইখ, আমার হাতের বইটি যদি আপনার বাহনে উঠিয়ে নিতেন, তাহলে বেশ উপকার হতো। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।’ উত্তরে তিনি বলেন, ‘নিতে পারি; তবে তার আগে উট চালকের অনুমতি নিতে হবে। কারণ, এটা ভাড়ায় চালিত বাহন। আর ভাড়া নেওয়ার সময় তাকে যখন সম্ভাব্য মালামাল দেখানো হয়েছে, তখন তোমার এই বইটি ছিল না।’

এরকম ক্ষুদ্র থেকে অতিক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যাতে কোনোভাবেই তাতে হারামের অনুপ্রবেশ না ঘটে কিংবা তার কারণে অন্য কেউ কোনোরূপ কষ্টের শিকার না হয়। বস্তুত আমাদের জীবনে খুব ধীরে ধীরে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ছোট ছোট বিষয় অবহেলা করার কারণে তা একসময় আমাদের

---

[১] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৮০

[৩] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম*, পৃষ্ঠা : ১৭

অভ্যাসে পরিণত হয়। আমরা পুরোপুরিভাবে হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ি।[১]

বর্ণিত আছে, একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি নদীর পারে ঘোড়া থামান। হাতের বর্শাটা মাটিতে গেড়ে ঘোড়াটা সেখানে বাঁধেন। এরপর ওযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। সালাত শেষ করে দেখেন, ঘোড়াটা ছুটে গিয়ে পাশের একটি ক্ষেতের শস্যাদি খাচ্ছে। এটা দেখে তিনি বলেন, 'এই ঘোড়ায় আর কখনো চড়ব না আমি। কারণ, ঘোড়াটা হারাম খেয়েছে। তাই এর দ্বারা কোনো উপকারও নেব না আমি আর।' এই বলে তিনি ক্ষেতের মালিককে ঘোড়াটা হাদিয়া দিয়ে দেন এবং নিজে অন্য একটি ঘোড়া কিনে সেখান থেকে চলে যান। অথচ তিনি চাইলে শরিয়ত মোতাবেক শস্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করে খেতের মালিককে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ঘোড়াটাই তাকে দিয়ে দেন।[২]

এমনই ছিল ইবনুল মুবারকের সততা ও আল্লাহভীরুতা। তিনি আখিরাতকে নিরাপদ রাখার জন্য দুনিয়ার ক্ষতির পরোয়া করতেন না। তাই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ইবনুল মুবারকের তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলতেন, 'এসব কারণেই আল্লাহ তাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।[৩]

কথিত আছে, তিনি মার্ভ শহরের জামে মসজিদে জুমআ ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করতেন না। কারণ, এই মসজিদের কিছু অংশ আব্বাসি গভর্নর আবু মুসলিম খোরাসানি জোরপূর্বক দখল করে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেছিল।[৪]

ইবনুল মুবারক একবার সিরিয়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি কলম ধার নেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ফেরার সময় কলমটি তাকে ফেরত দিতে ভুলে যান। মার্ভ শহরে এসে দেখেন, কলমটি তার জিনিসপত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে। এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিরিয়া চলে যান এবং কলমটি বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন।[৫]

---

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৩৮

[২] *কুনুযুল আউলিয়া*, পৃষ্ঠা : ১৮৬

[৩] *আল ওয়ারউ*, পৃষ্ঠা : ৫

[৪] *আল ওয়ারউ*, পৃষ্ঠা : ১৭

[৫] *সিফাতুস সাফওয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩২৯

ইবাদত ও আল্লাহভীতি

সুমহান আল্লাহ বলেন—

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...﴿١٣﴾

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক আল্লাহভীরু।[১]

ইবনুল মুবারকের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে মহান আল্লাহর ইবাদত করেছেন। সমস্ত অর্থসম্পদ দান করেছেন আল্লাহর পথে। দ্বীনের জন্য ব্যয় করেছেন অকাতরে। শারীরিক শ্রমসাধ্য ইবাদত করেছেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদও করেছেন। দিনের বেলা সিয়াম পালন করেছেন। আবার রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়েছেন। সারাজীবন ইলমের প্রচার-প্রসারে কাজ করে গিয়েছেন। গরিব-দুখী ও পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিয়েছেন। মানুষকে সৎকাজের আদেশ করেছেন। অসৎকাজ থেকে বারণ করেছেন। অবসর সময়টুকু নফল সালাত, যিকির, তিলাওয়াত ও দুআ-মুনাজাতে নিমগ্ন থেকেছেন। এত কিছুর পরও তিনি সর্বদা তটস্থ থাকতেন আল্লাহর ভয়ে। গভীর রাতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরাতেন।

আবদাহ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাসসিসা শহরে থাকাকালে ইবনুল মুবারক আসরের সালাত আদায়ের পর কিবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন। নিমগ্ন হতেন যিকির ও তিলাওয়াতে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর উঠতেন না। এমনকি এ সময় কারও সাথে কথাও বলতেন না তিনি।[২]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চেয়ে অগ্রসর আর কাউকে দেখিনি।[৩]

---

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

[২] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৯

[৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, পৃষ্ঠা : ২৫৫

আলি ইবনুল হাসান ইবনি শাকিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনুল মুবারকের চেয়ে বড় আলিম, সুন্দর তিলাওয়াতকারী ও অধিক সালাত আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। তিনি আবাসে ও প্রবাসে সারা রাত সালাত আদায় করতেন। কুরআন তিলাওয়াত করতেন খুব ধীরে ধীরে। লোকচক্ষুর আড়ালে উটের হাওদা কিংবা তাঁবুর ভেতর সালাত আদায় করতেন।[১]

একবার এক ব্যক্তি তাকে বলেন, 'গত রাতে আমি এক রাকাআতে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করেছি।' এ কথা শুনে ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে গত রাতে শুধু সুরা তাকাসুর পড়েই কাটিয়ে দিয়েছে; সামনে এগুতে পারেনি। কারণ, তিনি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করেন। কুরআনের অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন।' (উদ্দেশ্য তিনি নিজেই)[২]

তিনি সর্বদা ইবাদতে গোপনীয়তা বজায় রাখতেন। নিজেকে রিয়া বা লৌকিকতার প্রভাবমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালাতেন। কুতন ইবনু সাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারক কখনো সিয়াম ভাঙেননি। কিন্তু কেউ বুঝতে পারত না যে, তিনি সিয়াম পালন করছেন।'[৩]

মুহাম্মাদ ইবনু আয়ুন রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইবনুল মুবারকের বিশিষ্ট সহচর। যুদ্ধে ও অন্যান্য সফরে তিনি তার সহযাত্রী হতেন। তিনি বলেন, 'একবার আমরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, রাতের বেলা ইবনুল মুবারক যথাসময়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আলগোছে উঠে গিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। একদিন আমি হাতের বর্শাটা মাটিতে গেড়ে তার ওপর মাথা রেখে ঘুমের ভান করে বসে থাকি। ইবনুল মুবারক মনে করেন, সবার সাথে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই শোয়া থেকে উঠে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ফজর পর্যন্ত একটানা সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির করেন। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে জাগাতে আসেন। 'মুহাম্মাদ' বলে ডাক দিতেই বলে ফেলি, আমি জেগে আছি। এতে তিনি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে যান। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাকে সবসময় এড়িয়ে চলতেন। খুব বেশি কথা বলতেন না। আমি তার

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৬

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২৫১

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৭

চেয়ে গোপনে ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি।'[১]

তিনি বেশির ভাগ সময় যিকিরে মগ্ন থাকতেন। চেষ্টা করতেন, দিনের শেষ মুহূর্তটা যেন যিকিরের মধ্য দিয়ে কাটে। তিনি বলতেন, 'যার দিনের শেষটা যিকিরে কাটে, তার যেন সারা দিনটাই যিকিরে কাটল!'[২]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারক কিতাবুর রিকাক[৩] পড়ার সময় অস্থির হয়ে যেতেন। দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হতো তার সমগ্র মনন। আমরা তখন তার সামনে যাওয়ার কিংবা তাকে প্রশ্ন করার সাহস পেতাম না।'[৪]

তিনি প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করতেন। আশপাশের লোকদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। বিখ্যাত জ্ঞানতাপস উযাইল ইবনু ইয়াযকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, মৃত্যু আর পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নাও।[৫]

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার আমরা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে সফরে ছিলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এই লোকটির মধ্যে এমন কী আছে, যে কারণে সে সমকালীন আলিমদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়? সে ইবাদত করে; আমরাও করি। সে সিয়াম রাখে; আমরাও রাখি! সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে; আমরাও করি! সে হজ করে; আমরাও তো করি! তাহলে তার আর আমাদের মাঝে পার্থক্যটা কোথায়? সফরের পুরোটা সময় আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরি।

যাত্রাপথে আমরা এক বাড়িতে উঠলাম রাত কাটানোর জন্য। বাড়িটা বেশ ছিমছাম নিরিবিলি। তবু কেন যেন আমার ঘুম আসছিল না। তাই মনে মনে জিকির করছিলাম আমি। আচমকা ঘরের পিদিমটা নিভে গেল। ঘোর আঁধারের মাঝে কেটে গেল খানিকটা সময়। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ দেখি কেউ একজন বের হলো ঘর থেকে। পিদিম হাতে নিয়ে খানিক বাদে প্রবেশ করলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল

---

[১] *তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তা'দিল*, পৃষ্ঠা : ২৬৬

[২] *তবাকাতুশ শারানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫৯

[৩] আখিরাতের স্মরণ ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব-বিষয়ক হাদিসসমূহ।

[৪] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৭

[৫] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৮০

মুবারক। পিদিমের আলোয় তার মুখটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখের জলে ভিজে গেছে তার সমগ্র দাড়ি। তখনই আমি বুঝে ফেলি, এই আল্লাহভীরুতাই তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে এবং আমাদের থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দিয়েছে।' আলো নিভে যাওয়ায় ঘর যখন অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল, ইবনুল মুবারকের হৃদয়ে তখন আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় জেগে উঠেছিল। তাই তিনি অঝোরে কাঁদছিলেন।'[১]

একদিন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জীবনী আলোচনা করার সময় মন্তব্য করেন, 'আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা কেবল তার মাঝে থাকা আল্লাহভীতির কারণেই।'[২]

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদিস, ফকিহ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও গুণচর্চার পাশাপাশি তাসাউফচর্চাও করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন মহান সাধক ও বরেণ্য ইমাম। অধিকন্তু তৎকালীন আলিম ও সুফিসাধকদের মধ্যে যারা তাসাউফের সঠিক পরিচয় ও প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাদের একেবারে শীর্ষে। তার মতে, তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির অর্থ পরিপূর্ণভাবে ইসলামি শরিয়ত অনুসরণ করা। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ে তোলা। নিষিদ্ধ কার্যকলাপ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পার্থিব মোহ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা। সেই সাথে জান্নাত পাবার জন্য বেশি বেশি দুআ করা এবং জাহান্নামের ভয়ে মানবীয় ও চারিত্রিক কলুষতা থেকে নিজেকে হিফাযত করা।

হাল জামানার যে সকল নামধারী সুফিসম্রাট শরিয়তের ধার ধারে না; সালাত-সিয়াম বাদ দিয়ে আল্লাহর ইশক ও মহব্বতলাভের দাবি করে এবং রাসুলের সুন্নাহ ছেড়ে নিজেকে 'আশিকে রাসুল' হিসেবে পরিচয় দেয়; আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মোটেও তাদের মতো ছিলেন না।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২১

[২] *আল ওয়ারউ, পৃষ্ঠা* : ৭৩

কারণ, তিনি তাসাউফচর্চার আগে করেছেন ইলমচর্চা। তাসাউফের ইমাম হওয়ার আগে হয়েছেন ইলমের ইমাম। তাই তার আত্মোন্নয়নের প্রতিটি ধাপ ছিল শরিয়ত সম্মত। সাধনার প্রতিটি স্তর ছিল সুন্নাহর আবর্তে ঢেলে সাজানো। জীবনাচারের প্রতিটি চিত্র ছিল তাসাউফের মহিমায় বিমূর্ত। তিনি ধনী ছিলেন, তবে বিলাসিতাকে মনে স্থান দিতেন না। সম্পদশালী ছিলেন, তবে অপচয়কে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। শক্তিশালী ছিলেন, তবে জুলুম পছন্দ করতেন না। সাহসী ছিলেন, তবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতেন না। সুফি ছিলেন, কিন্তু জিহাদ-অস্বীকারকারী ছিলেন না। তিনি পুণ্যবানদের ভালোবাসতেন। তাদের সান্নিধ্যলাভের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, 'সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানদের আলোচনায় রহমত বর্ষিত হয়।'[১]

দুনিয়ার রং-তামাশা, বিত্ত-বৈভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্তই অর্থহীন মনে হতো তার কাছে। সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন তিনি। একবার আহমাদ ইবনু হামিদ আল-আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনি এক বছর পর মৃত্যুবরণ করবেন। অতএব, আপনি যদি এখন থেকেই সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন!'

উত্তরে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আপনি অনেক দীর্ঘ সময়ের কথা বলেছেন। এক বছরও কি বেঁচে থাকব আমি? আদৌ কি এর কোনো নিশ্চয়তা আছে?'[২]

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির প্রচলিত যে নীতি আমরা অনুসরণ করি, ইবনুল মুবারকের নীতি ছিল এর চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। তার মতে, অলস মস্তিষ্কের প্রতিলালন, তাগুতের লেজুড়বৃত্তি এবং অন্যায়ের মৌন সমর্থন তাসাউফ সমর্থিত কাজ নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসের ওপর আমল করতে পারাই তাসাউফের সর্বোচ্চ পর্যায়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

---

[১] *তবাকাতুশ শারানি,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬০

[২] *তানওয়িরুল কুলুব,* শাইখ আমিন আল-কুরদি, পৃষ্ঠা : ৪৯০

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে উত্তম।[১]

বাতিলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল তার তাসাউফের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ। অধিকন্তু তিনি আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল্লাহ[২]-এর নীতি পরিহার করাকে তাসাউফ বলতে নারাজ ছিলেন। উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন এমন এক সুফি-সাধকের, যিনি সুফি হওয়ার পাশাপাশি হয়ে উঠবেন একজন বিজ্ঞ ফকিহ। হবেন কর্মদক্ষ ও সৎসাহসী; বিচক্ষণ ও যুগসচেতন। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবেলার ক্ষমতা রাখবেন। কর্মতৎপর হবেন; অথর্ব কিংবা গোঁড়া হবেন না।

সার কথা হচ্ছে, তখনকার যুগে সুফিদের মাঝে দুটি ধারা প্রচলিত ছিল। প্রথম ধারার অনুসারীরা জনসম্পৃক্ততা ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের চেয়ে জনবিচ্ছিন্নভাবে ইবাদত করাকে বেশি পছন্দ করতেন। তাদের মতে, এর ফলে ইবাদতে একাগ্রতা আসে এবং পার্থিব ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকা যায়। ফুযাইল ইবনু ইয়ায, দাউদ আত-তায়ি এবং ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরও অনেক মনীষী এই ধারার অনুসারী ছিলেন।

দ্বিতীয় ধারার অনুসারীরা ছিলেন ঠিক এর বিপরীত। তাদের মতে জনসম্পৃক্ততা ও সামাজিক জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়া ব্যক্তিগত ইবাদতে নিমগ্ন থাকার চেয়ে উত্তম। এ কারণে মানুষের বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় তারা এগিয়ে আসতেন সবার আগে। এই ধারার পুরোধা ব্যক্তিবর্গ হলেন ইমাম আবু হানিফা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবনু আবি লাইলা এবং ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। আমাদের মতে, এই দ্বিতীয় ধারাটিই প্রণিধানযোগ্য।

সামাজিকতা ও জনসম্পৃক্ততা রক্ষায় মূলনীতি হিসেবে ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলেন—

'জনবিচ্ছিন্নতা মানুষের সাথে শত্রুতা নয়তো দূরত্ব তৈরি করে; আবার অতিরিক্ত জনসংযোগের কারণে অযোগ্য কিংবা অসৎসঙ্গীও জুটে যায়। কাজেই নিরাপদ

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৭৯২

[২] একমাত্র আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাঁরই জন্য শত্রুতাপোষণ।

হচ্ছে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা—সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নও না হওয়া; আবার মানুষের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠও না হওয়া।'[১]

[১] বিস্তারিত—*ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* : দ্বিতীয় খণ্ড

কৃতিত্ব ও অবদান

গ্রন্থাবলি

ইমাম বুখারির জীবনীতে এসেছে যে, তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে হাদিসের অনুসন্ধান শুরু করার আগে ইবনুল মুবারকের বইগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করেছেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর।[১]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনু আদম বলেন, 'জটিল কোনো বিষয় সামনে এলে, আমি সাধারণত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের রচনাবলি থেকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি। সেখানে পেয়ে গেলে শুকরিয়া আদায় করি। আর না পেলে সবর হয়ে যায় আমার একমাত্র সঙ্গী।'[২]

কিন্তু আফসোসের বিষয়, তাতারদের আক্রমণ ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থার ভুলত্রুটির কারণে তার অনেক কিতাবই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাস কেবল তার অল্প কিছু রচনাই রক্ষা করতে পেরেছে। দামেশকের মাকতাবাতুয যাহিরিয়ায় তার রচিত কয়েকটি কিতাবের খণ্ডবিশেষ পাওয়া যায়। এছাড়া ইতিহাসের বিভিন্ন উৎসগ্রন্থে তার যেসব কিতাবের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে—

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৫৬

■ কিতাবুল আরবায়িনা হাদিসান[১]

এই মূল্যবান গ্রন্থে চল্লিশটি জীবন-ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সংকলন করা হয়েছে। তিনি ছাড়া আরও অনেকেই এভাবে 'আরবায়িনা' বা চল্লিশ হাদিস সংকলনের কাজ করেছেন। তবে জনশ্রুতি রয়েছে, নব এই ধারাটি চালু হয়েছে তারই হাত ধরে। এই ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিচের হাদিসটি তাকে বিশেষভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে—

"

عَن عَلِيِّ بن أَبِي طالِبٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حديثا يَنتَفِعُونَ بِها، بَعَثَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ فَقِيهًا عالِمًا

আমার উম্মতের কল্যাণে যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদিস সংরক্ষণ করবে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাকে আলিম ও ফকিহ হিসেবে দাঁড় করাবেন।[২][৩]

■ কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ

এই কিতাবে হাসান ইবনু সুফইয়ান কর্তৃক হিব্বান ইবনু মুসার সূত্রে ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো স্থান পেয়েছে। এই কিতাবের কয়েকটি খণ্ডের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় খণ্ডটি পাণ্ডুলিপি আকারে মাকতাবাতুয যাহিরিয়ায় সংরক্ষিত আছে।

■ কিতাবুল জিহাদ

জিহাদ সম্পর্কে রচিত সর্বপ্রথম মৌলিক গ্রন্থ এটাই। এই বইটিতে দুইশ বাষট্টিটি মারফু হাদিস এবং সাহাবিদের বাণী ও অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন ঘটনা স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মাকতাবাতুল আশরাফ প্রকাশনী *কিতাবুল জিহাদ* নামেই এ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন মুহতারাম শাইখ আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ।

---

[১] *আর রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ*, পৃষ্ঠা : ৮৬

[২] *জামিউস আহাদিস*, সুয়ূতী, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৯৬

[৩] হাদিসটি একাধিক সনদে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে

■ কিতাবুয যুহদি ওয়ার রাকাইক

এ বইটি হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উস্তায মুহতারাম হাবিবুর রহমান আযমি হাফিযাহুল্লাহ তাহকিক[১] করেছেন। বইটির পিডিএফ অনলাইনে বেশ সমাদৃত।

■ কিতাবুল মুসনাদ

দামেশকের মাকতাবাতুয যাহিরিয়ায় কিতাবুল মুসনাদের শেষ দুই খণ্ড[২] পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি হাফিয আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইবনুল হাফিয মুহাম্মাদ ইবনি আসাকিরের হাতে লেখা। এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু হয়েছে নিচের হাদিসটি দিয়ে—

“

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ قَدْرَ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَهُ وَلا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

কোনো ব্যক্তি আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের মূল্য উপলব্ধি করতে চাইলে, সে যেন তার ওপরের শ্রেণির কারও দিকে না তাকিয়ে নিচের শ্রেণির কারও দিকে তাকায়।

এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম জানা যায়, যেগুলো সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। গ্রন্থগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো—

এক. কিতাবুল ইসতিযান।[৩] **দুই.** কিতাবুত তারিখ।[৪] **তিন.** কিতাবু তাফসিরিল কুরআন।[৫] **চার.** কিতাবুদ দাকাইক ফির রাকাইক।[৬] **পাঁচ.** কিতাবু রিকায়িল ফাতওয়া।[৭] **ছয়.** কিতাবুস সুনান ফিল ফিকহ।

---

[১] তাহকিক অর্থ যাচাই ও পরিমার্জন।

[২] দ্বিতীয় ও তৃতীয়

[৩] *আর রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ*, পৃষ্ঠা : ৪২

[৪] *হাদিয়াতুল আরিফিন*, খতিব বাগদাদি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৩৮

[৫] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৩৮

[৬] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৩৮

[৭] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৩৮

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত কিতাবগুলো ছাড়াও ইবনুল মুবারকের বেশ কিছু বই রয়েছে। তবে সেগুলোর অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই সাথে বিস্মৃত হয়েছে সেসবের নাম ও পরিচিতি। এ গ্রন্থগুলো পৃথিবীর বুকে আজও টিকে থাকলে ইসলামি সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হতো বলে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ এই মহান ইমামকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

কাব্যপ্রতিভা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে আল্লাহ তাআলা এক অনন্য প্রতিভা দান করেছিলেন। তিনি দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভের পাশাপাশি পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছেন আরবি ভাষা, ব্যাকরণ, অলংকার এবং কথা ও কাব্যসাহিত্যে। শৈশবে তার পিতা তাকে কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা জোগাতেন। আবু তুমায়লা বলেন, 'আমার এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বাবা ব্যাবসায়িক পার্টনার ছিলেন। তারা আমাদের বলতেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে একটি কবিতা শোনাতে পারবে, তাকে এক দিরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে।' আবু গাসসান বলেন, 'পারিবারিক এমন উৎসাহের কারণে তাদের দুজনের কবিসত্তাই একসময় বিকাশিত হয়ে ওঠে।'[১]

শৈশব থেকেই ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধভাষী। তিনি একটি কথা প্রায়ই বলতেন, 'ভাষার প্রমিত উচ্চারণে ঘাটতি থাকা, চেহারায় ব্রণের দাগ থাকার চেয়েও অধিক পীড়াদায়ক।'[২]

ইবনু জুরাইজ বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারকের চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'[৩] ইবনু জুরাইজ ছাড়াও প্রায় সকল জীবনীকার একই অভিমত

---

[১] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ২৯৪

[২] *বাহজাতুল মাজালিস*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬৫

[৩] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬

ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তারা এ কথাও বলেছেন যে, 'তিনি একজন রুচিশীল কবি ও বক্তা ছিলেন।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা সকলেই তার কবিতা ও কাব্য-প্রতিভার মূল্যায়ন ও বিশদ বর্ণনার বিষয়টি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। এর কারণ হয়তো এটাই যে, সালাফদের অনেকের চোখে কাব্যানুরাগ খুব একটা প্রশংসনীয় ছিল না। কারণ, জাহেলি যুগের কাব্যচর্চা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

বিভ্রান্ত লোকেরাই কেবল কবিদের অনুসরণ করে।[১]

উল্লেখ্য, এই আয়াতে আমাদেরকে সুস্থ সাহিত্য ও কাব্যচর্চার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়নি; বরং অশ্লীল ও অনর্থক কাব্যরচনার সমালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআন-হাদিসচর্চার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। মুহাদ্দিসগণ রাতদিন হাদিস সংগ্রহ করে যেতেন। ফকিহগণ কুরআন-হাদিসের আলোকে নিত্য-নতুন সমস্যার সুন্দর সমাধান দিতেন। সাধারণ মানুষ তাদের দেওয়া নির্দেশনা ও সমাধান অনুযায়ী দ্বীনচর্চা করতেন। পেশাগত কারণে দূরে কোথাও সফরে গেলে সেখানকার মুহাদ্দিস ও ফকিহদের শরণাপন্ন হতেন। তাদের কাছ থেকে আহরণ করতেন হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান।

যারা দূরদূরান্তে যেতেন না, তারা হজের মৌসুমের অপেক্ষা করতেন। এই সময়টা ইলম অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ। কারণ, তখন মক্কায় দেশ-বিদেশ থেকে বিখ্যাত আলিমদের আগমন ঘটত। স্থানীয় ও প্রবাসীরা তাদের সান্নিধ্য লুফে নিতেন; জেনে নিতেন ফিকহের নানা জটিল বিষয়ের চমৎকার সমাধান। এভাবে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেন ইসলামের মৌলিক রূপরেখা। এটাই ছিল তখন তাদের একমাত্র নেশা, পেশা ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়টা ছিল দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান সংকলনের সময়; কাব্যচর্চার নয়। তাছাড়া আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও কোনো অংশে কম নয়। কারণ, কুরআন-হাদিস-সহ ইসলামের শারঈয় বিধান সম্পূর্ণ আরবি ভাষায়। তাই ব্যাকরণ-সহ বিশুদ্ধ আরবি জানাটা ছিল একজন শিক্ষার্থীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

---

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ২২৪

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই চতুর্থ খলিফা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু আবুল হাসান আদ-দুআলি রাহিমাহুল্লাহকে ইলমুন নাহু তথা আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ব্যাকরণগত কারণেও বিভিন্ন সময় কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে; নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে পূর্বেকার কবি-সাহিত্যিকদের ভাষারীতি উল্লেখ করতে হয়। তাছাড়া রসবোধসম্পন্ন বহু গবেষক শ্লোক আকারে আরবি ব্যাকরণের নিয়মনীতি উল্লেখ করে থাকেন। এসব কারণে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রে কবিতা, শ্লোক ও পঙ্‌ক্তির ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। সর্বোপরি হাসসান ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ বেশ কয়েকজন সাহাবিও কাব্যচর্চা করতেন।

কাজেই বলা যায়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রেও কাব্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্তকরণ-সহ নানাবিধ কারণে শৈশব থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কাব্যচর্চা করতেন। তবে তার সময়টা যেহেতু হাদিস ও ফিকহচর্চার, তাই কাব্যের পেছনে তিনি অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতেন না। তাছাড়া কাব্যচর্চা সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> **কাব্যচর্চা যদি আলিমদের মর্যাদার পরিপন্থি না হতো, তাহলে আজ আমি বিখ্যাত কবি লাবিদের চেয়েও বড় কবি হতাম।**

কাব্যে সুস্থ চেতনার চর্চা

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর প্রতিটি কবিতায় ঈমানি চেতনা ভাস্বর হয়ে উঠত, দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীরুতার নানা উপাদানের সমাবেশ ঘটত; হিকমাহ ও প্রজ্ঞার গভীর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যেত। সেই সঙ্গে থাকত দ্বীন ও ইসলামের পথে জীবন বিলিয়ে দেবার অনিঃশেষ আকুতি। তিনি আজীবন শাহাদাতের যে তামান্না বুকে লালন করেছেন, তার কবিতার শব্দে ও ছন্দে সেই তামান্নাই ব্যক্ত করে গিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সাদ বলেন, 'তার কবিতা থেকে যুহদ, দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহর পথে জিহাদের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।'[১] ইবনু কাসির বলেন, 'তার কবিতাগুলো ঝরঝরে, প্রাঞ্জল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা সুশোভিত।'[২]

---

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৭২

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৭৭

সাধারণ কবিদের মতো তিনি কখনো আমির-উমারা ও শাসকশ্রেণির মনস্তুষ্টির জন্য কাব্যচর্চা করতেন না। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা সুনাম-সুখ্যাতির প্রতিও তার কোনো ঝোঁক ছিল না। কেবল শৈল্পিক উপায়ে দ্বীনের বাণী সকল শ্রেণির মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শব্দের মালা গাঁথতেন। এ কারণে তার অধিকাংশ কবিতায়ই শব্দের চেয়ে মর্মের ঝংকার বেশি শোনা যায়। নিচে তার কয়েকটি কবিতা ও কবিতাংশের নমুনা দেওয়া হলো—

قد يفتح المرء حانوتا لمتجره   وقد فتحت لك الحا نوت بالدين

بين الاساطين حانوت بلا غلق   تبتاع بالدين اموال السلاطين

صيرت دينك شاهينا تصيد به   وليس يفلح أصحاب الشواهين

সবাই যখন দোকান খোলে এটা-ওটা বেচতে

তুমি তখন দেদারসে করে যাও ধর্মের কারবার!

রাজমহলের মধ্যখানে কপাটবিহীন ছোট্ট দোকানে

সাজিয়েছ ধর্মের বেসাতি; বসিয়েছ ভাগ সরকারি মালে।

ধর্ম তোমার কাছে বাজপাখি ছাড়া অন্য কিছু তো নয়

একে দিয়েই তুমি গড়ে তুলেছ সম্পদের পাহাড়

মনে রেখো, এসব পাখিওয়ালা কখনো সফল হয় না জীবনে![১]

একই বিষয়ের অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

أرَى أناساً بأدنَى الدينِ قدْ قنعُوا   ولاَ أراهمْ رضُوا فِي العيشِ بالدونِ

فاستغنِ باللهِ عنْ دنيَا الملوكِ   كمَا استغنَى الملوكُ بدنياهمْ عنِ الدينِ

কিছু মানুষ দেখেছি এমন—অল্প আমলে তুষ্ট ভীষণ।

হায় আফসোস, দুনিয়ার কাজে কতই না অগ্রগমন!

রবের পরে ভরসা করে ফিরে এসো প্রমোদ থেকে

যেমন দুনিয়ামত্ত শাসকরা সব ছুটছে দ্বীনকে রেখে।[২]

---

[১] ওয়াফায়াতুল আইয়ান, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৩৬

[২] বাহজাতুল মাজালিস, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩১৩

■ সঙ্গী নির্বাচন-বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন—

وإذا صاحبت فاصحب صاحباً   ذا حياء وعفاف وكـرم
قائلاً لشيء إن قلـت لا   وإذا قلت نعم قال نعم

শালীনতা, উদারতা, সদাচার, শুদ্ধাচার—খুঁজে পাবে যার মাঝে,
নিঃসংকোচে সকল কাজে আজীবনের তরে বন্ধু বানাও তারে
যদি কভু কোনো কাজে হঠাৎ করে বলে ফেলো, হ্যাঁ কিংবা না
তবু সে তোমার সাথে হবে সম্মত, রক্ষা করবে বন্ধুতার সম্পর্ক।

■ শত্রুতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি কবিতায় তিনি বলেন—

كل العداوات قد ترجى إماتتها   إلا عداوة من عاداك من حسد
فإن في القلب منها عقدة عقدت   وليس يفتحها راقٍ إلى الأبد
إلا الإله فإن يرحم تحلّ به   وإن أباه فلا ترجوه من أحد

একদিন থেমে যাবে সকল শত্রুতা,
থামবে না কেবল হিংসাপ্রসূত দ্বন্দ্ব।
মনের ভেতর বাস করে এমন এক গিঁট
যা কখনো আপনা থেকে খুলে যাবার নয়।
পরম করুণাময় যদি খুলে দেন দয়া করে,
তবেই আশা করা যায় ভালো কিছু পাবার।[১]

■ গুনাহের নানাবিধ কুফল ও গুনাহমুক্ত জীবনের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

رأيت الذنوب تميت القلوب   وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب   وخير لنفـــــــسك عصيانها

[১] আল আকদুল ফারিদ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৪৯

দু-চোখ ভরে দেখছি আমি আজীবন,
অবিরাম পাপ বিবেককে করে চলে দংশন,
কলুষিত হয়ে পড়ে নির্মল দেহ-মন।
পাপাসক্তি নিভিয়ে দেয় হৃদয়ের জাগরণ
পাপ ত্যাগে মানুষ ফিরে পায় নবজীবন
নফসের সাথে লড়ে খুঁজে পায় সুখের ভুবন।[১]

[১] বাহজাতুল মাজালিস, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৩৪

ইতিহাসের পাতায় ইবনুল মুবারক

ইবনুল মুবারক সম্পর্কে গবেষক আলিমদের মূল্যায়ন

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি বলেন, 'হাদিসশাস্ত্রে আমাদের ইমাম হচ্ছেন চারজন—এক. সুফইয়ান আস-সাওরি । দুই. ইমাম মালিক ইবনু আনাস। তিন. হাম্মাদ ইবনু যায়িদ। চার. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। আর এই চারজনের মধ্যে ইবনুল মুবারকের অবস্থান সকলের শীর্ষে।'

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আলি ইবনুল মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুই ব্যক্তি উম্মাহর সমস্ত ইলমের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এক. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ। দুই. ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন।

একবার ইমাম ফুযাইল ইবনু ইয়ায, সুফইয়ান আস-সাওরি এবং আরও কয়েকজন শাইখ মাসজিদুল হারামে বসে ছিলেন। এমন সময় দূর থেকে ইবনুল মুবারককে আসতে দেখা যায়। তখন সুফইয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলে ওঠেন, 'এই মহান ব্যক্তি প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় আলিম।' প্রতিউত্তরে ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, 'তিনি কেবল প্রাচ্যের নন; বরং প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং এ দুইয়ের মাঝে সমগ্র অঞ্চলের সবচেয়ে বড় আলিম।'

ইবরাহিম ইবনু শাম্মাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। সবচেয়ে বড় মুত্তাকি ফুযাইল ইবনু ইয়ায আর সবচেয়ে

বড় হাফিযুল হাদিস হচ্ছেন ওয়াকি ইবনুল জাররাহ।’[১]

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন মুজাহিদদের গর্ব।’[২]

আসওয়াদ ইবনু সালিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আদর্শ পুরুষ। সুন্নাহর ক্ষেত্রে সর্বাধিক আস্থাভাজন। কাজেই কেউ তার ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য করলে বুঝতে হবে, সেই লোকটার দ্বীনদারিতায় খাদ রয়েছে।’[৩]

বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে তার পরিচয়

তাকরিবুত তাহযিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘ইবনুল মুবারক ছিলেন হাদিসশাস্ত্রে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। একজন বিশিষ্ট আলিম ও বিজ্ঞ ফকিহ। উদার ও দানশীল ব্যবসায়ী। বীর মুজাহিদ। তার মাঝে প্রশংসনীয় সকল গুণের সুন্দর সমাবেশ ঘটেছিল।’[৪]

আল-ইবার নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘ইবনুল মুবারক ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইমাম, বিজ্ঞ আলিম ও ফকিহ, হাফিযুল হাদিস ও মহান সাধক, অতুলনীয় গুণাবলির অধিকারী। বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব, বদান্যতা ও জিহাদি চেতনায় তার মতো আর কেউ ছিল না।’[৫]

ইমাম যাহাবি তার বিখ্যাত *তাযকিরাতুল হুফফায* গ্রন্থে বলেন, ‘ইবনুল মুবারক মুজাহিদদের অহংকার, যাহিদ ও সাধকদের আদর্শ, অগণিত কিতাবের রচয়িতা। পাশাপাশি একজন সফল ব্যবসায়ী ও সাহসী মুজাহিদ...’

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৪

[২] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৩

[৩] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] *তাকরীবুত তাহযিব*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৪৫

[৫] *আল ইবার*, পৃষ্ঠা : ২৮০

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'ওয়াল্লাহি, আমি একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। কারণ, তিনি তাকওয়া, ইবাদত, ইখলাস, আল্লাহর পথে সংগ্রাম, ইলমের ব্যাপ্তি, জ্ঞানের গভীরতা এবং বদান্যতা ও সহমর্মিতা-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। আমি আশা করি, তাকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ আমাকে পুরস্কৃত করবেন।'[১]

চার. ইমাম নাওয়াওয়ি রাহিমাহুল্লাহ তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আবু আব্দির রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একজন ইমাম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তার আলোচনা করলে রহমত বর্ষিত হয়। তাকে ভালোবাসলে ক্ষমার আশা করা যায়।'[২]

খলিফা হারুনুর রশিদ ও একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

বাগদাদে তখন রাক্কা নামে একটা শহর ছিল। খলিফা হারুনুর রশিদের শাহিমহল ওখানেই অবস্থিত। একদিন তিনি স্ত্রীর সাথে খোশগল্পে মেতে আছেন। হঠাৎ মহলের বাইরে প্রচণ্ড হইচই শোনা গেল। জানালায় চোখ রাখতেই খলিফা দেখতে পেলেন, ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিপাশ। মনে হচ্ছে, বাইরের কোনো শত্রুপক্ষ শহরের ভেতরে হামলা চালিয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত হতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক পাঠালেন সেখানে। তারা খবর নিয়ে এলো, 'যুদ্ধ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো কিছু ঘটেনি। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাক্কা শহরে প্রবেশ করেছেন। মানুষজন তাকে স্বাগত জানাতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ভীড় জমিয়েছে তার আশপাশে।'

মুফতী শফি উসমানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'লোকেরা যখন ইবনুল মুবারককে অভ্যর্থনা জানাতে দলে দলে সমবেত হয়, তখন ধূলিকণার প্রকোপে তিনি হাঁচি দেন এবং সুমহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ—اَلْحَمْدُ لِله—'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। প্রতিউত্তরে বিশাল জনতা একসাথে—يَرْحَمُكَ الله—'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে ওঠে। এতেই শব্দবিস্ফোরণ ঘটে।'

---

[১] তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৩

[২] তাহযিবুল আসমা-ই ওয়াল লুগাত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮৫

হারুনুর রশিদের স্ত্রী শাহিমহলের চূড়া থেকে এমন দৃশ্য দেখে যারপরনাই অবাক হন। জিজ্ঞেস করেন, 'এই মহান ব্যক্তি কে, যার জন্য এত মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে?'

লোকেরা জানায়, 'তিনি খোরাসানের বিখ্যাত আলিম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক।'

তখন তিনি বলে ওঠেন, 'ওয়াল্লাহি, তিনিই তো প্রকৃত বাদশাহ!'

এরপর হারুনুর রশিদের কাছে তার স্ত্রী জানান, 'জনাব! আপনি তো মনে করেন, আপনিই সবচেয়ে বড় বাদশাহ। অর্ধজাহান আপনার শাসনে চলছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাদশাহি আপনার নয়; আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও তার মতো ব্যক্তিবর্গের হক। তাছাড়া প্রকৃত বাদশাহ তো তারাই, যারা মানুষের হৃদয়রাজ্যে রাজত্ব করে। একটু খেয়াল করে দেখুন, কোনো পুলিশ তাদের হাঁকিয়ে আনেনি; বরং তারা আগন্তুকের প্রতি ভালোবাসার টানে ছুটে এসেছে এখানে।[১]

---

[১] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শারানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৮৪; *তারিখু বাদগাদ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৫৬

অনন্তের পথে

১৮১ হিজরি তথা ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। মৃত্যুর দিনক্ষণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার অন্তিম মুহূর্তটি সবদিক থেকেই কল্যাণময়। সেদিন জিহাদ শেষে 'গাজি' বেশে ফিরছিলেন তিনি। সেই সাথে বছরের শ্রেষ্ঠ মাস, রহমতের শেষ দিন এবং তাহাজ্জুদের সময়। জীবদ্দশায় ঠিক যে মুহূর্তে রবের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতেন, ঠিক সে মুহূর্তেই তিনি পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তার কবরের মাটি সুশীতল রাখুন।

ইরাকের ফুরাত নদীর পশ্চিমে 'হীত' নগরীর বুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ইবনুল মুবারক। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। বাগদাদ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৯০ কি.মি.। হীত নগরীতে তার কবর এখনো রয়েছে। শত শত মুসলিম সেখানে গিয়ে তার কবর যিয়ারত করেন।

অন্তিম মুহূর্তে

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, তখন তার ক্রীতদাস নাসরকে বলেন, 'আমার মাথাটা মাটিতে রাখো।' এতে নাসর কাঁদতে শুরু করে। ইবনুল মুবারক জিজ্ঞেস করেন, 'কী হলো, তুমি কাঁদছ কেন?' সে উত্তরে বলে, 'সাইয়িদি, আপনার ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা মনে পড়ছে আমার। আপনি চাইলে আজীবন ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে পারতেন। কিন্তু কখনোই তা

করেননি। আজ সব ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় এই জনশূন্য মরুভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন'—এই বলে সে আবারও ডুকরে কেঁদে ওঠে। ইবনুল মুবারক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'রবের কাছে এমনটাই তো প্রার্থনা করতাম আমি—যেন ধনী হয়ে জীবনযাপন করি, আর নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করি। যাহোক, আমাকে শাহাদাহ পাঠ করাও, আমি নিজ থেকে কথা না বলা পর্যন্ত আর কোনো কথা বলবে না।'[১]

মৃত্যুর সময় একজন তাকে কালিমার পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল, 'বলুন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' সে বারবার উদ্বুদ্ধ করার কারণে ইবনুল মুবারক বলেন, 'এভাবে না। আমি আশঙ্কা করছি, তুমি আমার পরে অন্যদেরও এভাবে কষ্ট দেবে। তোমার কথায় মৃত্যুপথযাত্রী একবার শাহাদাহ পাঠ করলেই তুমি চুপ হয়ে যাবে। অবশ্য এরপর যদি অন্য কোনো কথা বলে, তবে পুনরায় কালিমার পাঠে উদ্বুদ্ধ করবে—যাতে তার শেষ কথাটি হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'[২]

একেবারে অন্তিম মুহূর্তে তিনি শেষবারের মতো চোখ খোলেন। এরপর নাসরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۝

এমন সাফল্যের জন্যই পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।[৩][৪]

তার মৃত্যুর খবর শুনে গোটা মুসলিম উম্মাহ শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, সালাম ইবনু মুতি', ফুযাইল ইবনু ইয়ায, আবু ইসহাক আল-ফাযারি রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরও অনেক মনীষী তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

তার মৃত্যুসংবাদ খলিফা হারুনুর রশিদ পেয়েছিলেন; তবে একটু অন্যভাবে। ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর 'হিরা'-এর গভর্নর খলিফার নিকট এই মর্মে পত্র পাঠান যে, 'হীত' নগরীতে এক অচেনা আগন্তুক মৃত্যুবরণ করেছে। লোকেরা সেখানে ভিড়

[১] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৪৮২

[২] গাইলুল আওয়াহিরুল মুগিয়াহ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫২৯

[৩] সুরা সাফফাত, আয়াত : ৬১

[৪] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৪৮১

করছে এবং ক্রমেই তাদের ভিড় বেড়ে চলেছে। মৃত ব্যক্তিটির নাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক খোরাসানি।'

পত্রটি পড়ামাত্র খলিফা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' এরপর উজির 'ফজল'কে ডেকে বলেন, 'যারা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে চায়, তাদেরকে আমার কাছে আসার সাধারণ অনুমতি দিয়ে দাও।' এমন ঘোষণায় 'ফজল' আশ্চর্যবোধ করলে তিনি বলেন, 'আফসোস! তুমি এখনো তাকে চিনলে না! আজকের এই মৃত মানুষটিই নিচের পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন—

الله يدفع بالسلطان معضلة   عن ديننا رحمة منه ورضواناً

لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل   وكان أضعفنا نهباً لأقوانا

আল্লাহ তাআলা ন্যায়পর শাসকের মাধ্যমে আমাদের দ্বীনকে হিফাজত করেন।
এটা তাঁর বিশেষ দয়া ও সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ।

শাসকশ্রেণি না থাকলে আমাদের পথঘাট নিরাপদ থাকত না। আর দুর্বলরা সবলদের হাতে লুণ্ঠিত হতো।

এখন তুমিই বলো, যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ শাসকশ্রেণির প্রতি এমন ভক্তিমূলক কথা বলে গিয়েছেন, তার হক আদায় করা কি আমাদের কর্তব্য নয়?'[১]

স্বপ্নে সাক্ষাৎ

❝

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

উবাদাহ ইবনু সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[২]

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৪; *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৩

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬৯৮৭

ওপরের হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, নেককার মুমিন ব্যক্তির স্বপ্নের বাস্তবতা রয়েছে। ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পর বিখ্যাত আবিদ ফুযাইল ইবনু ইয়ায তাকে স্বপ্নে দেখেন। তাদের কথোপকথন নিচে তুলে ধরা হলো—

'মৃত্যুর পর কোন আমলটি আপনার কাছে সর্বোত্তম মনে হয়েছে?'

'যে আমলটি নিয়ে আমি সারাজীবন ব্যস্ত ছিলাম।'

'জিহাদ ও সীমান্ত প্রহরা?'

'জি।'

'আল্লাহর পক্ষ হতে আপনি কেমন ব্যবহার পেয়েছেন?'

'আমি প্রভূত মাগফিরাত লাভ করেছি। এক জান্নাতি রমণীর সাথে আমার কথাও হয়েছে।'[১]

সাখর ইবনু রাশিদ রাহিমাহুল্লাহও তাকে একবার স্বপ্নে দেখেন। তাদের কথোপকথনও অনেকটা এমন—

'আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি?'

'জি, করেছি।'

'আপনার রব আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?'

'আল্লাহ আমার সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[২]

যাকারিয়া ইবনু আদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি স্বপ্নযোগে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে ক্ষমা করেছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'জি, হাদিসের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার কারণে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'[৩]

---

[১] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৯

[৩] *আর রিহলাতু ফি তলাবিল হাদিস*, খতিব বাগদাদি, পৃষ্ঠা : ৪৭

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরয়াবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইবনুল মুবারকের কী অবস্থা? তিনি কেমন আছেন ওখানে?' নবিজি উত্তর দিলেন, আল্লাহ যাদের অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের একজন। তার সাথে রয়েছেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সালিহগণ।[১] আর সঙ্গী হিসেবে তারা অতি উত্তম।'[২]

[১] সৎকর্মশীল বান্দা

[২] *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ১৬৯

অলৌকিক ঘটনা

আহলুস সুন্নাহর মতে সত্যিকার আল্লাহভীরু ও আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের ক্ষেত্রে কারামাত তথা অলৌকিক সব ঘটনা ঘটার অবকাশ রয়েছে। তবে কারামাত প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা খুব জরুরি—

এক. কারামত কী?

কারামত হলো অতিপ্রাকৃত কোনো ঘটনা—যা আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের মাধ্যমে তাদের জীবদ্দশায় অথবা মৃতুর পরে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঘটিয়ে থাকেন। পাশাপাশি এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বিশেষ কোনো বান্দাকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেন; তাকে কল্যাণের চাদরে জড়িয়ে নেন অথবা এর মাধ্যমে সত্য ও সত্যের অনুসারীদের সাহায্য করেন।[১]

কারামাতের সংজ্ঞায় শাইখ সুলাইমান ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কারামাত এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ মুমিন ও মুত্তাকি বান্দাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাদের দুআ বা বিশেষ কোনো নেক আমলে সন্তুষ্ট হয়েই আল্লাহ মূলত এমনটি করে থাকেন। কাজেই এতে বান্দার কোনো হাত থাকে না।'[২]

---

[১] *ফাতওয়া আল-লাজনাতুত দায়িমা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৮৮

[২] *তাইসিরুল আযিযিল হামিদ*, পৃষ্ঠা : ৪১৩

দুই. ইতঃপূর্বে সংঘটিত কয়েকটি কারামত

■ সুরা কাহাফে উল্লেখিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা। এই ঘটনায় দেখা যায়, তারা মহান রবের কৃপায় তিনশো বছরেরও অধিক সময় মাটির বিছানায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। অথচ তাদের শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়নি কিংবা দৈহিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

■ ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়াম বিনতে ইমরানের নিকট নিয়মিত উপাদেয় খাবার ও ফলমূল উপস্থিত হতো। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম অবাক হতেন।[১]

■ একদা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সারিয়া। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন মদিনায় খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ তারস্বরে বলে ওঠেন, 'সারিয়া, পাহাড়টা পেছনে রাখো! সারিয়া, পাহাড়টা পেছনে রাখো!' সেনাদলটি ফিরে আসার পর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তারা বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আমরা যুদ্ধে প্রায় হেরে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখন কোত্থেকে যেন একটি আওয়াজ শুনতে পাই—'সারিয়া, পাহাড়টা পেছনে রাখো, পাহাড়টা পেছনে রাখো!' সাথে সাথে আমরা দিক পাল্টে ফেলি। বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন।[২]

একটি কথা

বর্তমানকালে অনেকে কারামাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। অনেক ক্ষেত্রে যার কারামাত বর্ণনা করা হয়, দেখা যায়, সে সরাসরি শরিয়ত-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে এটা বোঝা গেল যে, কারামত প্রকাশ পাবার জন্য পুরোপুরি সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে; আল্লাহর নিকটতম বান্দা হতে হবে। নয়তো কারামাত নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি শরিয়তের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে। কিছু কিছু মানুষ কারামাতের নামে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, যা খুবই নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক।

---

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৭

[২] *আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৫

প্রকৃত আল্লাহভীরুগণ তাদের কারামাতের ঘটনাগুলো প্রকাশ করেন না। ইবনুল মুবারকের ইবাদত ও বিনয়-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, শেষরাতের ইবাদতও তিনি সবার কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করতেন। আসলে যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা এবং যাদের মাধ্যমে এসব কারামাত প্রকাশিত হয়, তারা কখনো মানুষের কাছে সেগুলো বলে বেড়ান না।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের ব্যাপারেও এমন কিছু কিচ্ছা-কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়, যেগুলোর নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যসূত্র নেই। এসব আজগুবি ঘটনার অবতারণা অনর্থক সময়-নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া এসব বানোয়াট গল্প বলে বেড়ানো গুনাহের শামিল। তাই আমরা সেগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি।

দুআ কবুলের ঘটনা

কারামাত হিসেবে এখানে ইবনুল মুবারকের দুআ কবুল-সংক্রান্ত দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। ঘটনা দুটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। তার সম্বন্ধে হাসান ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনুল মুবারক মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি যে দুআ করতেন সে দুআই কবুল হতো।'[১]

প্রথম জীবনে আল-হাসান ইবনু ঈসা একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। একবার তিনি ইবনুল মুবারকের সাথে হাঁটছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারক তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোন ধর্মের?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি খ্রিষ্টান।' তখন ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার জন্য এই বলে দুআ করেন—'হে আল্লাহ, আপনি তাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করুন।' এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই আল-হাসান ইবনু ঈসা ইসলাম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন পরিপূর্ণ দ্বীনদার। এরপর ইলমের জন্য, মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। একসময় উম্মাহর বিজ্ঞ আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন তিনি।[২]

আবু ওয়াহব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার ইবনুল মুবারক কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক অন্ধ লোকের সাথে তার দেখা হয়। অন্ধ

---

[১] *তাহযিবুত তাহযিব*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬

[২] *তারতিবুল মাদারিক*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৬২

লোকটি তার হাতদুটি ধরে করুণ সুরে বলল, 'আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।' ইবনুল মুবারক তার জন্য দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি এই দৃষ্টিহীন মানুষটির দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চোখের জ্যোতি ফিরে পেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি নিজের চোখে দেখেছি।'[১]

[১] তাহযিবুত তাহযিব, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৮৬; আল ফাওয়াইদুল বাহিয়াহ, পৃষ্ঠা : ১০৪; যাইলুল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৩১

যে বাণী হৃদয় জাগায়

আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের প্রসঙ্গে

» মুমিনদের জন্য সবচেয়ে পরিতৃপ্তির বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। কিন্তু দুনিয়াপ্রেমীরা আজীবন এই তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে।[১]

কুরআনের জ্ঞানলাভ সম্পর্কে

» শুদ্ধভাবে সালাত আদায়ের জন্য যতটুকু কুরআনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ততটুকু অর্জন করার পর প্রত্যেকের উচিত জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত হওয়া। কারণ, এর ফলেই মূলত কুরআনের অর্থ ও পূর্ণাঙ্গ ভাব উপলব্ধি করা সহজ হয়।

কুরআনের অভিশাপ সম্পর্কে

» কোনো হাফিযে কুরআন যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়, কুরআন তখন চিৎকার করে বলে ওঠে, তোমার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক। তুমি কি তোমার রবকে একটুও ভয় করো না? তোমার ভেতর কি একটুও পাপবোধ কাজ করে না?[২]

---

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৭

[২] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ১৮১

ইলমের মাহাত্ম্য ও প্রভাব সম্পর্কে

» আমরা ইলম শিখি দুনিয়া পাবার জন্য। অথচ ইলম আমাদের শেখায় দুনিয়া বর্জন করতে।[১]

» আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে মহৎ কাজ আর নেই। অপরদিকে, দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে জঘন্য কাজ আর দ্বিতীয়টা নেই।[২]

ইলম ও আল্লাহভীতি সম্পর্কে

» তোমাদের মধ্যে যে যত বেশি জ্ঞানী, সে যেন আল্লাহকে তত বেশি ভয় করে চলে।[৩]

» কিছু মানুষ নিজেকে অনেক বড় পণ্ডিত মনে করে। অথচ তাদের ভেতর দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীরুতার ছিটেফোঁটাও নেই![৪]

ইলম ও দুনিয়া সম্পর্কে

» প্রতিটি জ্ঞানচর্চাকারী জ্ঞানের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা শয়তানের ধোঁকায় দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। জ্ঞান অর্জনের প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে পার্থিব মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।[৫]

ইলমের মূল্য সম্পর্কে

» আল্লাহ তাআলা একবার নবি সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোনটা পেতে চাও? ইলম নাকি ক্ষমতা? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ইলম চাই।' আল্লাহ খুশি হয়ে তাকে ইলমের সাথে ক্ষমতাও দান করলেন।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৮

[২] *আল-আদাবুশ শারইয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২১৭

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[৫] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

কারণ, ক্ষমতা সবসময় ইলমের অনুগামী।[১]

ইলম বিতরণে কুণ্ঠাবোধ

» যে ব্যক্তি জ্ঞান কুক্ষিগত করে রাখে, কাউকে কিছু শেখাতে চায় না কিংবা শেখাতে গিয়ে অল্পতেই বিরক্ত হয়ে যায়, সে নিচের তিনটি বিপদের যেকোনো একটিতে পতিত হয়—এক. অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। দুই. স্মৃতিভ্রংশ। তিন. শাসকের রোষানল। এসব বিপদাপদ দ্বারা আল্লাহ তার জ্ঞান অকেজো করে দেন।[২]

প্রকৃত আলিম সম্পর্কে

» যে ব্যক্তি পার্থিব লালসা ত্যাগ করে পরকালীন চিন্তায় মনোনিবেশ করে, সে-ই প্রকৃত আলিম।[৩]

» যে ব্যক্তি নিজেকে সবজান্তা মনে করে, সবসময় জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব নিয়ে চলে, জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে থাকে, সে আলিম নয়, একটা গণ্ডমূর্খ![৪]

» প্রকৃত আলিমের কাছে দুনিয়াবি সাফল্য কখনো চূড়ান্ত গন্তব্য নয়। আবার, জাগতিক ব্যর্থতাও তাকে পরাজিত করতে পারে না।[৫]

বিভিন্ন পেশা ও ব্রত সম্পর্কে

» আলিমগণ হলেন নবিদের উত্তরসূরি। তারা যদি দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তবে সাধারণ মানুষ কাদের অনুসরণ করবে?

» ব্যবসায়ীগণ আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা। তারা যদি ক্রেতাকে ঠকান, পণ্যের দোষত্রুটি গোপন রাখেন, তবে মানুষ কাদের বিশ্বাস করবে?

---

[১] *জামিউ বায়ানিল-ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১১৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৯৭

[৩] *আল ওয়ারউ*, ইমাম আহমাদ : ৭৪

[৪] *আল-মুজালাসাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৬

[৫] *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৭

» মুজাহিদগণ আল্লাহর মেহমান। তারা যদি অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে নেন, তবে মুসলিমদের বিজয় কীভাবে আসবে?

» দুনিয়াত্যাগীরা হলেন পৃথিবীর বাদশাহ। তারা যদি 'লোকে কী ভাববে, মানুষ কী বলবে'—এসব নিয়ে চিন্তা করেন, তবে সাধারণ মুসলিম কাদের আদর্শ মানবে?

» শাসকগণ হলেন জনগণের রক্ষক। তারা যদি হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হন, তবে মেষপালের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?[১]

দুনিয়ার প্রকৃতি ও তার মোহ সম্পর্কে

» প্রকৃত মুমিনের জন্য দুনিয়া হচ্ছে বন্দিশালা। এই বন্দিশালায় তার প্রধান কাজ ধৈর্যধারণ করা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করা। ক্ষণস্থায়ী এ জগতে মুমিনের সম্পদ বলতে কিছু নেই। তার যাবতীয় সম্পদ পরকালের কোষাগারে সঞ্চিত।[২]

» দুনিয়ার প্রতি মোহ অন্তরকে কলুষিত করে। তখন আর অন্তরে ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে না।[৩]

» দুনিয়া ক্ষণিকের সুখ-দুখের চেয়ে বেশি কিছু নয়।[৪]

প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ সম্পর্কে

» যে ব্যক্তি পার্থিব অর্থসম্পদ পেলে আনন্দিত হন না; আবার এগুলো হাতছাড়া হলে হা-হুতাশও করেন না—তিনিই প্রকৃত সাধক ও দুনিয়াবিমুখ।[৫]

শাসকদের নিকট গমন সম্পর্কে

» যে ব্যক্তি শাসকদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদে যাওয়া-আসা করে,

---

[১] *যাইলুল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৩০

[২] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ৮৩

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৭

[৪] *তাবাকাতুশ শাবানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬০

[৫] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ভূমিকা; *তারতিবুল মাদারিক*, কারি ইয়ায, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪০

তাকে সত্যের কাণ্ডারি বলা যায় না। সত্যের কাণ্ডারি তো সে-ই যে শাসকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যায়।[১][২]

সাধনা সম্পর্কে

» সুফি-সাধকগণের মর্যাদা প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। কেননা রাজা-বাদশাহরা অর্থকড়ি ঢেলে লোকলস্কর দিয়ে জনসমাবেশ তৈরি করে; অপরদিকে সুফিরা সর্বদা জনসমাগম এড়িয়ে চলেন; তবু মানুষ তাদের পিছু ছাড়ে না।[৩]

খ্যাতির বিড়ম্বনা সম্পর্কে

» নিভৃতচারী হতে শেখো। খ্যাতির মোহ ত্যাগ করো। নিজের সম্পর্কে কখনো এ কথা বলো না, খ্যাতি অর্জনের ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। কেননা, এটাও এক ধরনের আত্মপ্রচার।

» নিজের ব্যাপারে কখনো যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার দাবি করতে নেই। কেননা, এমন দাবির অর্থই হলো মানুষের প্রশংসা ও সুদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করা। আর এটা স্পষ্টতই যুহদ পরিপন্থি।[৪]

ধনাঢ্যতা সম্পর্কে

» কারও কাছে যদি ১০ হাজার দিরহামও থাকে, তবু তার আয়-রোজগার বাদ দিয়ে বেকার বসে থাকা উচিত নয়। কারণ, এতে সে প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাহায্য করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। কিংবা নিজের পরিবারকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হবে।[৫]

---

[১] কারণ, এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যারা শাসকদের কাছ থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে, তারা কখনো শাসকদের সামনে দাঁড়িয়ে হক কথা বলতে পারে না; উল্টো নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আজীবন চাটুকারিতা করে যায়।

[২] *আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক*, শাইখ উসমান জামাল, পৃষ্ঠা : ২৩৭

[৩] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[৪] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শারানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১; *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৩

[৫] *আল মুনতাযম*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ১৬১

ধনাঢ্যতা ও দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে

» একবার ফুযাইল ইবনু ইয়ায আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলেন, আপনি সবাইকে দুনিয়াবিমুখ হতে বলেন, অর্থসম্পদের মোহ ত্যাগ করতে বলেন, অথচ আপনি নিজেই তো জমিয়ে ব্যবসা করছেন! তখন ইবনুল মুবারক বলেন, অর্থসম্পদ উপার্জন আর সম্পদের প্রতি লালসা এক নয়। আমি অর্থ উপার্জন করি আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলার জন্য; অন্যের করুণার পাত্র হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং দ্বীনের পথে অকাতরে দান করার জন্য।[১]

দ্বীনি ভাইদের অবস্থা সম্পর্কে

» দ্বীনি কাজে দ্বীনি ভাইদের পাশে না পেয়ে যে পরিমাণ কষ্ট পেয়েছি, অন্য কোনো কারণে এত বেশি কষ্ট পাইনি।[২]

সঙ্গী নির্বাচন করা সম্পর্কে

» সৎ, দ্বীনদার ও গরিব-দুখী মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। আর বিদআতি ও ধর্মচ্যুতদের থেকে দূরে থাকবে।[৩]

দোষ গোপন রাখা সম্পর্কে

» যদি তোমার কোনো দ্বীনি ভাইয়ের মাঝে বিশেষ কোনো দোষ দেখতে পাও, তবে তাকে গোপনে সে বিষয়টা জানাবে। সম্ভব হলে পরামর্শ ও সদুপদেশ দিয়ে সাহায্য করবে। এতে তুমি একই সাথে দুটির কাজের সাওয়াব পাবে।[৪]

উপদেশ গ্রহণ করা সম্পর্কে

» আমার জানামতে, বর্তমান পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে উপদেশ কিংবা কল্যাণকর কথা মন থেকে মেনে নিতে আগ্রহী।[৫]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৮৭

[২] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৫

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৯৯

[৪] *রাউযাতুল উকালা*, পৃষ্ঠা : ১৯৭

[৫] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫০

কয়েক টুকরো উপদেশ

» সবসময় চোখের হিফাযত করে চলবে। এতে মনোযোগ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

» সর্বদা পরিমিত কথা বলবে। তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেড়ে যাবে।

» পেট পুরে খাবে না কখনো। বেশি খেলে ইবাদতে মন বসে না, অলসতা চলে আসে।

» অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। এতে নিজের দোষগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনার সুযোগ পাবে।

» কখনো আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা করবে না। নয়তো সংশয় ও সন্দেহ খুব সহজেই তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে।[১]

সাহাবি ও তাবিয়িগণের সঙ্গলাভ সম্পর্কে

» শাকিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করেন, অথচ আমাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলেন না কেন? তিনি বললেন, আমি তো তখন সাহাবি ও তাবিয়িদের সান্নিধ্যে থাকি। প্রশ্ন করা হলো, এটা কী করে সম্ভব? তারা সকলেই তো মৃত! প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'আমি যখন ইলমচর্চা করি, তখন সাহাবি ও তাবিয়িদের রেখে যাওয়া পদচিহ্ন ও শুদ্ধাচার খুঁজে পাই।'[২]

জীবিকা উপার্জন করা সম্পর্কে

» পরিবারের জন্য জীবিকা উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই।[৩]

মানুষকে মূল্যায়ন করা সম্পর্কে

» গুণীজন কখনো তিন শ্রেণির মানুষকে অবজ্ঞা করে না—এক. আলিমদের। কারণ, আলিমদের অবজ্ঞা করলে তার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। দুই. ন্যায়পরায়ণ

---

[১] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ৮৮

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৫

বাদশাহকে। তাকে অবজ্ঞা করলে তার দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে। **তিন.** ভাই ও সহকর্মীদের। তারা পাশে না থাকলে প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব হারাতে হবে।[১]

জীবনের অর্জন সম্পর্কে

» আমি চার হাজার হাদিস থেকে মাত্র চারটি কথা শিখেছি—**এক.** কখনো কোনো নারীর ওপর ভরসা করবে না। **দুই.** অর্থসম্পদ নিয়ে গর্ব করবে না। **তিন.** এত বেশি আহার করবে না, যার ফলে পেটের পীড়া হয় এবং কাজে ব্যাঘাত ঘটে। **চার.** ততটুকু জ্ঞানার্জন করবে, যতটুকু তোমার কাজে আসবে; এর বেশি নয়।[২]

রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে

» রিয়া ও লৌকিকতার কারণে যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তার শাস্তি ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবে, যে সাধারণ গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে।[৩]

নীরব থাকার ফজিলত সম্পর্কে

» একদা লোকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কথা বলা যদি রৌপ্যের সমতুল্য হয়, তবে চুপ থাকাটা স্বর্ণের সমতুল্য। ইবনুল মুবারকের কাছে এই কথার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যমূলক কাজে কোনো কথা বললে, সে কথার মূল্য রূপার মতো। আর আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতামূলক কাজে কথা না বলে নীরব থাকলে, সে নীরবতার মূল্য স্বর্ণের মতো।[৪]

সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করা সম্পর্কে

» সন্দেহযুক্ত এক দিরহামের মায়া ত্যাগ করা, আমার কাছে লক্ষ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে উত্তম। (যেসব দানবীর অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ মসজিদ-

---

[১] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *তামবিহুল মুগতারিন,* পৃষ্ঠা : ৯৫

[৪] *আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক,* শাইখ উসমান জামাল, পৃষ্ঠা : ১৮৭

মাদ্রাসায় অকাতরে দান করেন, ওপরের কথাটি তারা ভেবে দেখার সময় পাবেন কি?[১]

প্রকৃত বিনয় সম্পর্কে

» প্রকৃত বিনয় হচ্ছে, ধনীদের সামনে আত্মসম্মান ধরে রাখা, মাথা উঁচু করে কথা বলা।[২] (উল্লেখ্য, প্রকৃত বিনয় হচ্ছে, গরিব ও অধস্তন মানুষদের সাথে কোমল আচরণ করা; ধনী ও ঊর্ধ্বতন মানুষদের সাথে নয়। তাছাড়া ধনীদের সামনে আত্মসম্মান ধরে রাখার উদ্দেশ্য হলো, ধনীরা যেন বুঝতে পারে, নিছক ধনসম্পদই সম্মানলাভের একমাত্র মানদণ্ড নয়। এতে তারা বিনয়ী হওয়ার সুযোগ পাবে, আত্মগরিমা থেকে মুক্ত হবে এবং গরিবদের অবজ্ঞা করা থেকে বিরত থাকবে।)[৩]

» বিনয়ের মূলকথা হচ্ছে, তুমি তোমার চেয়ে নিম্নবিত্তদের সামনে নিজেকে তুচ্ছ ভাববে যেন অর্থসম্পদের কারণে তাদের ওপর তোমার কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত না হয়। অপরদিকে তোমার চেয়ে উচ্চবিত্তদের সামনে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করবে—যেন সম্পদের অজুহাতে তোমার ওপর তাদের কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত না হয়।[৪]

নিয়ত সম্পর্কে

» নিয়ত অনেক ছোট আমলকেও বড় বানিয়ে দেয়;[৫] আবার অনেক বড় আমলও নিয়তের কারণে ছোট হয়ে যায়।

» একবার ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করা হয়, আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতারা বান্দার সৎকাজের নিয়ত সম্পর্কে কীভাবে বুঝতে পারে? তারা

---

[১] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[২] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর কাছে বিনয়ের সংজ্ঞা চাওয়া হলে তিনি উক্ত উত্তর দেন।

[৩] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

[৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন,* খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩৪২

[৫] *আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ-শাবানি,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১

তো গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না! উত্তরে তিনি বলেন, 'বান্দা ভালো কাজের নিয়ত করলে, ফেরেশতারা তার সুবাস পেতে শুরু করে এবং সেই সুবাসের ওপর ভিত্তি করেই তার জন্য সাওয়াব লিখতে থাকে।'[১]

আত্মপরিচয় সম্পর্কে

» নিজেকে জানো; শেকড় অনুসন্ধান করো।[২]

» যে-ব্যক্তি নিজের প্রকৃত পরিচয় জানে, সে নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম মনে করে।[৩][৪]

» যখন মানুষের গুণাবলি তার দোষ-ত্রুটির চেয়ে বেশি হয়, তখন দোষগুলো ঢাকা পড়ে যায়। আর যখন দোষ-ত্রুটি বেশি হয়, তখন তার গুণাবলির কোনো মূল্য থাকে না।[৫]

» একবার এক লোক ইবনুল মুবারককে বলেন, 'আমি নিজেকে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম মনে করি, যে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে।' প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'এই অপরাধ তোমার দ্বারা সংঘটিত হবে না, এমন নিশ্চয়তা কে দিলো?' এরপর তিনি আরও বলেন, জেনে রেখো, 'নিজেকে নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত মনে করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করার চেয়েও জঘন্য।'[৬]

শিষ্টাচার সম্পর্কে

» আদব ও শিষ্টাচার হচ্ছে দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ বা এর কাছাকাছি।[৭]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৩

[৩] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৬৫

[৪] অর্থাৎ, দুনিয়াতে কাউকে আমলনামা দেখানো হলে, সে তার অপকর্মের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেখে এবং পরকালীন পরিণতির কথা ভেবে নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম মনে করতে বাধ্য হবে।

[৫] *তাযকিরাতুল হুফফায*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৫

[৬] *তানবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৭] *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১২৮

সর্বোত্তম নিয়ামত সম্পর্কে

» মানুষের সবচেয়ে বড় নিয়ামত তার বুদ্ধিমত্তা। এরপর পর্যায়ক্রমে শিষ্টাচার, দরদি অভিভাবক, মৌনশক্তি এবং নাতিদীর্ঘ জীবন।[১][২]

ভয়ের বিষয় সম্পর্কে

» গুণীজন কখনো চারটি বিষয়ে নিজেকে ভয়শূন্য মনে করেন না—এক. অতীত কৃতকর্ম। কারণ, অতীতের পাপের জন্য আল্লাহ তার সাথে কেমন আচরণ করবেন তা সে জানে না! **দুই.** ভবিষ্যৎ জীবন। কারণ, সে জানে না, ভবিষ্যতে সে কোথায় লাঞ্ছিত হবে! **তিন.** প্রাপ্ত মর্যাদা। কারণ, হতে পারে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। **চার.** সফলতা। কারণ, হতে পারে এই সাফল্য তার অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করবে![৩]

ক্ষুধার্তকে আহার করানো সম্পর্কে

» ক্ষুধার্তের মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেওয়া আমার দৃষ্টিতে একটি মসজিদ নির্মাণের চেয়েও অধিকতর উত্তম। এমনকি যদি সেই মসজিদ আমি একাই নির্মাণ করি।[৪]

আনন্দের বিষয় সম্পর্কে

» আনন্দের বিষয় মূলত তিনটি—এক. দ্বীনি ভাইদের সান্নিধ্য। **দুই.** পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবিকার অধিকারী হওয়া। **তিন.** আল্লাহর জন্য কাউকে আজীবন মহব্বত করা।[৫]

---

[১] হাবিব আল-জাললাব ইবনুল মুবারককে মানুষের প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামতগুলো সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি পর্যায়ক্রমে উক্ত উত্তরগুলো প্রদান করেন।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৯৭

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৯৮

[৪] *তামবিহুল মুগতারিন*, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৮৭

পরিশিষ্ট

আলহামদু লিল্লা হিল্লাযি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস সালিহাত। সমস্ত প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যার অপার করুণায় সকল পুণ্যময় কাজ পূর্ণতা লাভ করে। জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলোর মাঝে আজকের এই মুহূর্তটিও যোগ হতে যাচ্ছে। আলহামদু লিল্লাহ। বইটির কাজে হাত দেওয়ার পর থেকেই এক অদ্ভুত প্রণোদনা অনুভব করছি। কাজে ও সময়ে অভূতপূর্ব বরকত পাচ্ছি। অন্যরকম চাঞ্চল্য ও উদ্যম অনুভব করছি সারা দেহমনজুড়ে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর বিশাল জীবনের ক্ষুদ্র একটি সংকলন। এই মহান ইমাম আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে যে আকাশচুম্বী খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন এবং উম্মাহর সকল মত ও পথের মানুষের কাছে তিনি যতটা সমাদৃত হয়েছেন, ইসলামি ইতিহাসে খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জুটেছে এমন সৌভাগ্য। তিনি রিজালশাস্ত্রে[১] 'আমিরুল মুমিনিন'[২] উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। কোনো মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। ফিকহশাস্ত্রে তার দক্ষতা, তাফসির ও আরবি সাহিত্যে তার পারঙ্গমতা, যুহদ ও ত্যাগ-তপস্যায় তার নিষ্ঠা এবং জিহাদের ময়দানে তার পাহাড়সম দৃঢ়তা—আমাদের অভিভূত করে; প্রেরণা জোগায় এবং হতবাক করে।

---

[১] রাবির বিচারে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণশাস্ত্র

[২] হাদিস ও রিজালশাস্ত্রের সর্বোচ্চ উপাধি

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তার বিচিত্র জীবনের প্রায় সবদিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সকল ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এমন কিছু আনা হয়নি, যা তথ্যসূত্রে নির্ভরতার বিচারে অনুত্তীর্ণ কিংবা পাঠকের মনে বিরক্তি এনে দিতে পারে।

সবশেষে কায়মনোবাক্যে একটাই প্রার্থনা, যাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির আশায় এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, তিনি যেন আপন দয়াগুণে এই গ্রন্থটি কবুল করে নেন। আমাদের শ্রমসাধনা একান্তই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিবেচনা করেন এবং এ কাজটির অসিলায় আখিরাতে আমাদের ক্ষমা করে দেন। ওয়াল্লাহু হুওয়াল মুসতাআন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মিযানুল ইতিদাল, ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

২. তাযকিরাতুল হুফফায, ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম আল-আসফাহানি

৪. তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল, ইবনু আবি হাতিম

৫. আল-ইতিসাম, ইমাম শাতিবি

৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, আবু হামিদ আল-হাযালি

৭. আল-আলাম, খাইরুদ্দিন আয-যারকালি

৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিয ইবনু কাসির

৯. বাহজাতুল মাজালিস, আল্লামা ইবনু আব্দিল বার

১০. তারিখু বাগদাদ, খতিব আল-বাগদাদি

১১. তাদরিবুর রাওয়ি, ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতি

১২. তারিখু দিমাশক, আল্লামা ইবনু আসাকির

১৩. তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদিল, ইবনু আবি হাতিম আর-রাযি

১৪. তাকরীবুত তাহযিব, ইবনু হাজার আসকালানি

১৫. তামবিহুল মুগতারিন, ইমাম শারানি

১৬. তাহযিবুল আসমাই ওয়াল লুগাত, ইমাম মুহিউদ্দিন নাওয়াওয়ি

১৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব হাম্বলি

১৮. আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়াহ, আব্দুল কাদের আল-কুরাশি

১৯. তাহযিবুত তাহযিব, ইবনু হাজার আসলাকানি

২০. রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াহ, শাইখ আবুল হাসান আলি নাদভি

২১. আর-রিহলাতু ফি তালাবিল হাদিস, খতিব আল-বাগদাদি

২২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

২৩. আশ-শিফা, কাজি ইয়ায

২৪. সিফাতুস সাফওয়া, আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি

২৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল্লামা ইবনু সাদ

২৬. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইমাম শারানি

২৭. আল-ইবার ফি আখবারি মান গাবার, আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

২৮. আল-ফিহরিসত, ইবনুল নাদিম

২৯. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়াহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়াহ, আল্লামা আব্দুল হাই আল-লাখনভি

৩০. কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদিস, আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি

৩১. কুররাতুল আউলিয়া, আবু লাইস আয-যাইলি

৩২. মুজামুল বুলদান, আল্লামা ইয়াকুত আল-হামায়ি

৩৩. মারিফাতু উলুমিল হাদিস, হাকিম আন-নাইসাবুরি

৩৪. আননুজুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, ইবনু তাগাররি

৩৫. ওয়াফায়াতুল আইয়ান, আল্লামা ইবনু খাল্লিকান

৩৬. নাইলুল আওতার, আল্লামা শাওকানি

৩৭. শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি

৩৮. মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ইমাম ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ

৩৯. ফাইযুল কাদির, আল্লামা মানাওয়ি

৪০. আদাবুল ইমলা-ই ওয়াল ইসতিমলা, আব্দুল করিম ইবনু মুহাম্মাদ আস-সামআনি

৪১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইমাম শারানি

৪২. তাওয়িলু মুখতালাফিল হাদিস, আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনি কুতাইবা

৪৩. আল-খাইরাতুল হিসান, আল্লামা ইবনু হাজার আল-হাইতামি

৪৪. কিতাবুল ওয়ারা, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল

৪৫. শারহু কিতাবিল আদাব- ভূমিকা, শাইখ আলবানি

৪৬. ফাইযুল কাদির শারহুল জামিয়িস সাগির, আল্লামা মানাওয়ি

৪৭. জামিউল আহাদিস, ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি

৪৮. আর রিসালাতুল মুসতাতরিফাহ, মুহাম্মাদ ইবনু জাফার

৪৯. হাদিয়াতুল আরিফিন, খতিব বাগদাদি

৫০. বাহজাতুল মাজালিস, আল্লামা ইবনু আব্দিল বার

৫১. আল-ইকদুল ফারিদ, ইবনু আবদি রাব্বিহি

৫২. আল-আদাবুশ শারইয়াহ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসি

৫৩. জামিউ বায়ানিল-ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ইবনু আব্দিল বার

৫৪. খাইরুল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ, মুল্লা আলি কারি

৫৫. তারতিবুল মাদারিক, কাজি ইয়ায

৫৬. আল মুনতাযম, আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি

৫৭. রাউযাতুল উকালা, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান

৫৮. ইকতিযাউল ইলমি আল আমাল, খতিব আল-বাগদাদি

৫৯. তাফসিরু ইবনি কাসির, আল্লামা ইবনু কাসির

৬০. কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক

৬১. মুজামুল উদাবা, আল্লামা ইয়াকুত আল-হামায়ি

৬২. মাকারিমুল আখলাক, খারাইতি

৬৩. আল-কালাইদ মিন ফারাইদিল ফাওয়াইদ, মুস্তফা আস-সিবায়ি

৬৪. তানওয়িরুল কুলুব, শাইখ আমিন আল-কুরদি

৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, শাইখ উসমান জামাল

নতুন প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ
০২	ফেরা-২	বিনতু আদিল
০৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা
০৪	হৃদয় জাগার জন্য	ইয়াসমিন মুজাহিদ
০৫	জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো	ড. হানান লাশীন
০৬	কাজের মাঝে রবের খোঁজে	আফিফা আবেদীন সাওদা
০৭	সুখের নাটাই	আফরোজা হাসান
০৮	ইমাম আবু হানিফা ﵀	আবুল হাসানাত
০৯	ইমাম শাফিয়ি ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন
১০	ইমাম মালিক ﵀	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
১১	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀	যোবায়ের নাজাত
১২	হাসান আল-বাসরি ﵀	আব্দুল বারী
১৩	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀	আবুল হাসানাত

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য (টাকা)
০১	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০২	পড়ো	ওমর আল জাবির	২২০
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০
০৬	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
০৮	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
০৯	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১০	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	২৩২
১১	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
১২	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৯০
১৩	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৭২
১৪	সেইসব দিনরাত্রি	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
১৫	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৬	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
১৭	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
১৮	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
১৯	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
২০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী	১৪১
২১	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০
২২	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২৩	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
২৪	সবর	ই[illegible] কাইয়্যিম	২৬০
২৫	ভালোবাসার রামাদান	[illegible]-কারনী	৩০৮

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম প্রতিভাধর এই মনীষীর আলোকিত জীবনকে এক অভিনব ভঙ্গিতে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। ফিকহশাস্ত্রে দক্ষতা, তাফসির ও আরবি সাহিত্যে পারঙ্গমতা, যুহদ ও ত্যাগ-তপস্যায় একনিষ্ঠতা, জিহাদের ময়দানে পাহাড়সম দৃঢ়তা-সহ তার বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রায় সবদিক নিয়েই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ে। আশা করি, আর্থসামাজিক পদস্খলনের এই যুগে পাঠকগণ এতে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

সমকালীন প্রকাশন

জ্ঞানের রাজ্যে ডুব দেবার এক নিরন্তর অভিযান। কখনো কেবল একটি হাদিসের জন্য তারা ছুটে গিয়েছেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে, কখনো-বা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন কোনো একটি আয়াতের নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবনে। তারা ছিলেন প্রাণবন্ত। সদা উৎফুল্ল। তাদের রাতগুলো ছিল ইবাদতময়। দিনগুলো কর্মমুখর। কুরআনের সাথে তাদের যেন গভীর এক মিতালি। নিঃসন্দেহে তারা সুন্নাহর অতন্দ্র প্রহরী। সত্যের এক প্রকৃত বন্ধু। মিথ্যার ঘোরতম শত্রু। তারা আমাদের মহান ইমাম। আমাদের পূর্বসূরি। সেই মানুষগুলো, যারা আলোকিত করে গেছেন আঁধারকালো পথ; দেখিয়েছেন সহজ-সরল পন্থা। আমাদের জন্য জ্ঞানরাজ্যের সকল দ্বার উন্মুক্ত করে যাওয়া সেই মহান মানুষগুলোর জীবনী আমরা মলাটবদ্ধ করেছি 'ইমাম সিরিজ'-এ।

ISBN
9 789849 484493

সমকালীন প্রকাশন